প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা-৫৪

প্রথম আনন্দ সংস্করণ : জুলাই ১৯৫৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মদন সরকার

মূল্য : ১০·০০

উৎসর্গ

শ্রীনীরদ বরণ মুখোপাধ্যায়
অগ্রজেষু
আমার লেখা সম্বন্ধে যাঁর
উৎসাহ আর প্রেরণা সর্বাধিক

ভূমিকা

আমি লেখক নই, লেখাটা আমার নেশা বা পেশা কোনটাই নয়, তবু লিখেছি মনের অসহ্য বেদনা চাপতে না পেরে, বিবেকের জ্বালায়, আর তাতে ইন্ধন যুগিয়েছেন কয়েকজন মরমী বুদ্ধিজীবী বন্ধু।

গত কয়েক বছর পশ্চিম বঙ্গের উপর ঝড় বয়ে গেছে। রাজপথ হয়ে গেছে রক্তিম, মনুষ্যত্বের বলি হয়েছে বারবার। দেখেছি, শুনেছি, কিন্তু কিছুই করতে পারি নি। দীনতায় আর লজ্জায় নিজের কাছে নিজেই ছোট হয়ে গেছি। ভয় আমাদের জীবনে ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিল, তবু ভয় যেন আর ভাঙতে চায় না। মানুষকে আমি বিশ্বাস করি। সেই বিশ্বাসের ভিত নড়ে গেলে বাঁচব কি নিয়ে? মূল্যবোধ কি হারিয়ে গেল সমাজের সমস্ত স্তর থেকে? নতুন মূল্যায়ন কি ধার্য হবে নেতি-বাচক পথ ধরে? নিজের জ্বালায় নিজেই জ্বলে মরেছি।

এমনি সময় একদিন আমার অত্যন্ত স্নেহের বন্ধু শ্রীমান নিরঞ্জন শিকদার চুঁচুড়া থেকে এসে আমায় তাড়া লাগাল, "সুধীরদা, আমরা একটা মিনি পত্রিকা বার করছি, আপনাকে লিখতে হবে।" এর আগে আরও দু'একজন আমাকে লিখতে বলেছিলেন, কিন্তু নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থাকায় লিখতে সাহস পাই নি। কিন্তু নিরঞ্জনকে এড়ানো গেল না। পর পর কতকগুলো লেখা "অনুসংহিতা"য় বেরিয়ে গেল। কয়েকটা বেরিয়েছিল—"অন্যমনে", "নবকলি," "আসর," "দেশ," "বাঙলার কথা" আর "রাষ্ট্রদূতে"। কতগুলি অনুবাদ বেরিয়েছে "বিশ্বমিত্র," "সন্মার্গ" ও "অব্যক্ত"তে। এখন নিয়মিতভাবে এর হিন্দী অনুবাদ বেরুচ্ছে "প্রেমাম্বরা"য়। অবশ্য অনুবাদ করেছেন আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন শ্রীমান মঙ্গল।

লেখার শুরুতে আমার অনেক বন্ধু আমাকে সাহায্য করেছেন

উৎসাহ দিয়ে, তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে। শ্রীসত্য বসু এবং শ্রীজ্যোতিকা রঞ্জন সমাদ্দারের কথা এই প্রসঙ্গে বারবার মনে পড়ে। অনেকে আবার ভয়ও পেয়েছেন। ছোট গল্পগুলি বইয়ের আকার নিয়ে বেরিয়ে এল, তাও আমার আরেক বন্ধু শ্রীসুনীল চক্রবর্তীর আগ্রহে। এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

লিখতে বসে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের অনেক ছাপ হয়তো পড়েছে, তবে চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বিশেষ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কটাক্ষ করা হয় নি। তবু যদি কেউ কোন মিল খুঁজে পান, জানবেন তা এসেছে আমার অজান্তে। তার জন্য মাপ চেয়ে নিতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নেই।

এ আমার প্রথম বই, শেষ বই কিনা জানি না। দোষ-ক্রটি হয়তো অনেক রয়েছে, তবু যদি পাঠকদের মনে আমার এই "ভাবনা"-গুলো বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারে, জানবো পরিশ্রম আমার সার্থক। আপনাদের সমালোচনাই হবে আমার ভবিষ্যতের পাথেয়।

মুখার্জি ভিলা
লেক গারডেন্স্
কলিকাতা-৪৫

সুধীর মুখোপাধ্যায়

সূচী

বদ্‌লা



এ পাড়ায় এসেছিস কেন? শালা জবাব দে!

ঘাড় ধরে জলার দিকে রতনকে টেনে আনে মানিকলাল। জবাব দেবার সময় আর পায় না রতন। জলাটা রক্তিম হয়ে ওঠে।

হাঃ হাঃ করে উন্মাদের মত হেসে ওঠে মানিকলাল। জামালের বদ্‌লা!……হাঃ হাঃ হাঃ—

পরের দিন লাশ শ্মশানে চলে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রতনের বৌ। মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে এক বছরের ছেলেটা। আর আট বছরের ছেলে যতন—তার কান্না বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে।

খুনী কে? সবাই জানে। মুখ খোলার সাহস নেই কারুর।

দিনের পর দিন যায়।

যতন এসে দাঁড়ায় একদিন—মানিকদা!

মুখ খিঁচিয়ে বলে ওঠে মানিকলাল, কি রে শালা, বদ্‌লা নিতে এসেছিস?

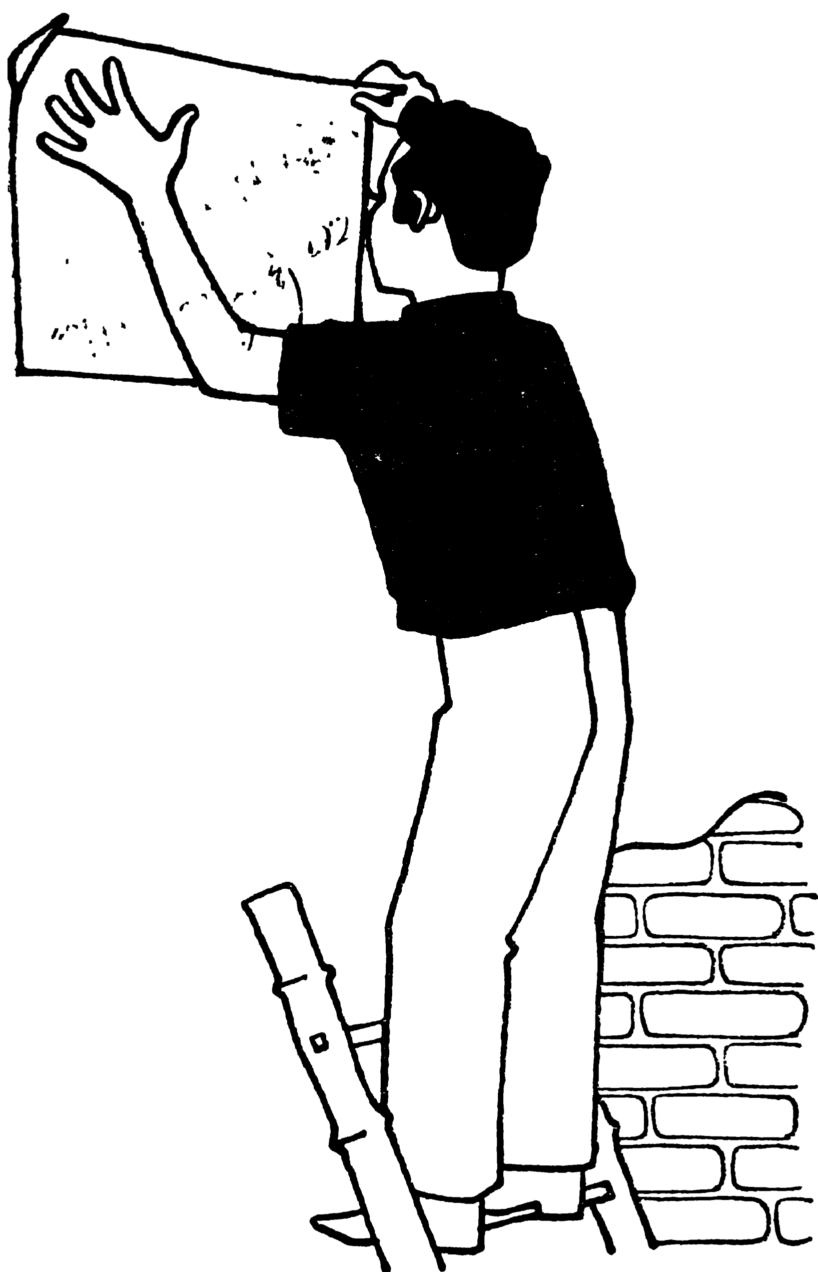
না মানিকদা!…বদ্‌লা! দম নিয়ে যতন বলে, ঝন্টু কাল থেকে খেতে পায় নি, মা মরার মত পড়ে আছে। বাবা তো মাইনে আনবার আগেই শেষ হয়ে গেল। আমি যে আর সইতে পারছি না। আমাকেও বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি মানিকদা।

ছোরাটা বাগিয়ে ধরে মানিকলাল—তারপর হঠাৎ ছোরাটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যতনকে বুকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে ওঠে।

কেউ কেউ বলেন—খুনের বদ্‌লা খুন…

আমি—না, আমি কিছু বলব না। আমি শুধু ভাববো—আর—ভাববো।

বোবা কান্না



একটি তেরো কি চোদ্দ বছরের ছেলে পোষ্টার লাগাচ্ছিল।

ছেলেটিকে বললাম, খোকা, পোষ্টার লাগানো হলে একবার ভেতরে এসো।

বিরক্ত হয়ে আমার বন্ধুটি উপহাস করে আমায় বললেন, ও আর এসেছে!

বন্ধুটিকে নিরাশ করে ছেলেটি কিন্তু ঠিক এল।

জিজ্ঞাসা করলাম, লেখাপড়া কতদূর করেছ?

জবাব দিল, ক্লাস ফাইভ অবধি।

পড়াটা ছাড়লে কেন?

ভাটের মাথায় ছেলেটি জবাব দিল, গোলামির পড়া পড়ে কি হবে?

বন্ধুটি জিজ্ঞেস করলেন, পোষ্টার লাগাচ্ছিলে কেন?

ছেলেটি বিদ্রূপের ভঙ্গী করে বলল, জানেন স্যার, আমাদের নতুন রাজ আসছে, এ বুর্জোয়া রাজ গেল বলে!

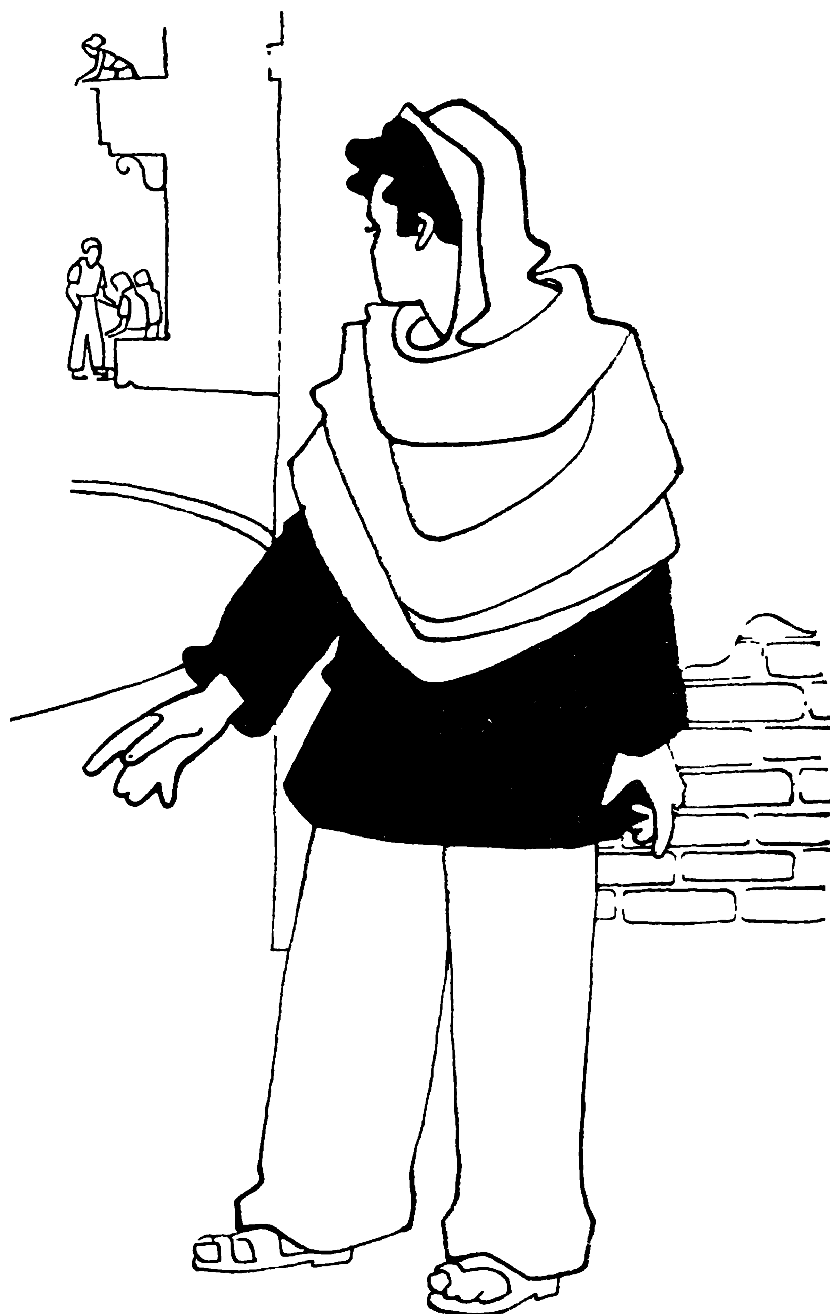
আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু তোমার রাজের গভর্ণমেণ্ট চালাতে হবে তো?

শার্টের কলারটা নাচিয়ে ছেলেটি বলল, নিশ্চয়!

কিন্তু তুমি তো কাজকর্ম কিছুই শিখলে না, পড়াশুনাও করলে না, তখন তুমি কি করবে? পোষ্টার লাগাবে?

ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, পরে ধরা গলায় বললে, একটা কাজ দেবেন, স্যার?

আমি জবাব দিতে পারি নি; জবাব দেবেন রাষ্ট্রপ্রধানরা। জবাব দেবেন হয়তো নেতারা। আমি সাধারণ মানুষ, আমি কিছু বলব না, আমি শুধু ভাবো—আর ভাববো।



তখন রাত প্রায় দশটা। বন্ধুর মেয়ের বিয়ে ছিল, সামাজিকতা সেরে ফিরছিলাম। সমস্ত পথটায় একটা থমথমে অন্ধকার। নির্জন পথ। দু-একটা কুকুর গুটিসুটি মেরে ডাষ্টবিনের পাশে পড়ে আছে। হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দে ফিরে তাকালাম।

মাষ্টারমশাই, আপনি এ পথ দিয়ে একা একা যাচ্ছেন?

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, আমার এক পুরনো ছাত্র শশাঙ্ক। বললাম, নূতনত্বটা কোথায় দেখলি? প্রাগৈতিহাসিক যুগে লোক বনে জঙ্গলে একা একা চলত না?

কিন্তু মাষ্টারমশাই, শশাঙ্ক বললে, সে যুগ আর এ যুগ!

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, তফাতটা কোথায় দেখলি? তখন অরণ্যে বেড়িয়েছি একা, আর আজ জনারণ্যে চলছি·· তাও একা—। দেখতে পাচ্ছিস না, একটা মানুষ খুন হয়ে গেলে পাশের মানুষটা ফিরেও তাকায় না। মানুষ কি আর মানুষ আছে রে! তা যাক সে কথা, তুই কোথায় চলেছিস?

বাড়ী ফিরছি মাষ্টারমশাই বলেই মাথাটা চাদরে ঢেকে নিল।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোকে বাড়ীতে ঢুকতে কি পিছনের রাস্তা দিয়ে যেতে হয়?

আপনি সেকালেরই রয়ে গেলেন মাষ্টারমশাই—একটু গলাটা নামিয়ে বলল, ঐ সোজা রাস্তায় বাড়ী গেলে আর ফিরতে হ'ত না। পথেই মুখের জিওগ্রাফী পাল্টে দিত।

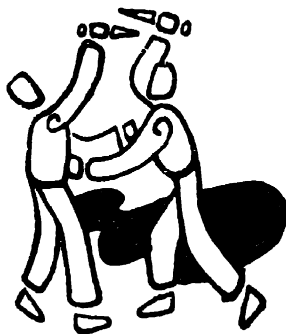
শশাঙ্কর মুখের দিকে তাকাতেই সে বিরক্ত হয়ে বলল, ও পাড়ায় ঐ পার্টির লোক আছে না, আমাদের পেলেই আর দেখতে হবে না।

এতক্ষণে বুঝলাম, তেইশ বছরের স্বাধীনতা আমাদের কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে! বাক্-স্বাধানতা তো আগেই গেছে, এখন পথচলার স্বাধীনতাটুকুও হারিয়েছি। দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বললাম, এর কোন প্রতিকার তোরা করতে পারিস না শশাঙ্ক?

কি যে বলেন মাষ্টারমশাই, ঐ সব বড় বড় কাজ নেতারা

করবেন।—বলেই পাশের গলির ভেতর সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক ঠিকই বলেছে। আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের করার কিছুই নেই। আমরা ভাববো—শুধু ভাববো আর ভাববো।



অন্ধকারের মানুষ



'আঃ, পাড়াটা আবার অন্ধকার হয়ে গেল, নাঃ, ইলেকট্রিক কোম্পানীর জ্বালায় আর পারিনে বাপু'—গিন্নী তাঁর বিশালকায় বপুটি নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মোমবাতির খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবছি। পিছন থেকে গিন্নীর অনুযোগ শুনতে পেলাম, 'সঙের মত দাঁড়িয়ে কি দেখছ? ইলেকট্রিক কোম্পানীকে একটা খবর দিতে হবে না?' পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ভাবতে ভাবতে বের হলাম।

কিছুদূর গিয়েই ইলেকট্রিক ফেলের কারণটি আবিষ্কার করে ফেললাম। মাথার উপরের তামার তারগুলি অদৃশ্য! বুঝলাম, আজ আর আলো পাবার আশা নেই। বহু পুরনো গানের একটি কলি অতি দুঃখেও মনে পড়ল, 'অন্ধকারের মানুষ মোরা, আলোর তৃষায় মিছেই ঘোরা।' দু-এক কলি গেয়েছিলাম কিনা মনে নেই, তবে দেখলাম দূরে টেরিলিনের প্যান্ট পরিহিত প্রশান্ত ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। আগেই কারণটি আবিষ্কার করেছিলাম, এবার কর্মীটিকেও আবিষ্কার করা গেল।

মনের ভাব গোপন করে বললাম, কি রে প্রশান্ত? আজকাল কি করছিস?

বিনয়ে গলে গিয়ে প্রশান্ত বলল, আজ্ঞে কাকাবাবু, ব্যবসাপত্র করছি একটু-আধটু। তা' আপনাদের আশীর্বাদে ভালই চলছে।

কিন্তু ব্যবসাটা বড় রিস্কি রে। জেল, বন্দুকের গুলি বা ইলেকট্রিক শকে প্রাণ যাওয়াটাও বিচিত্র নয়।

মুহূর্তের মধ্যে প্রশান্তর মুখে কে যেন কালি মাখিয়ে দিল। থমকে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল, কি করব, ভালভাবে বাঁচার সুযোগ কোথায়? পড়াশুনায় তো খুব খারাপ ছিলাম না। অভাবের জন্য ছাড়তে হলো। একটা চাকরির জন্য কি-ই না করেছি! কেউ ফিরে তাকায় নি। তারপর হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, রাজনৈতিক হানাহানির মাঝখানে করে যে নিজেই গুণ্ডা হয়ে গেছি জানি না। বড় বড় নেতারা·· যাক্ সে কথা। গুণ্ডা

বলেই এখন আমার খাতির, চাকরি কে দেবে? তারপর একটু থেমে ধরা গলায় বলল, এ ভাবেই হয়তো শেষ হয়ে যাব। ভালভাবে বাঁচতে কে দেবে কাকাবাবু?

পিঠে হাত দিয়ে ওকে শান্ত করতে করতে বললাম, রবিবার একবার দেখা করিস। দেখি যদি……

.. ..

তারপর পাঁচ বছর কেটে গেছে। প্রশান্তর সঙ্গে হঠাৎ নৈহাটির খেয়াঘাটে দেখা। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, কাকাবাবু! কাছেই আমার কোয়ার্টার, চলুন।—বলে এক রকম জোর করেই নিয়ে গেল। চোখ জুড়িয়ে-যাওয়া পরিচ্ছন্ন ছিমছাম কোয়ার্টারটি। উঠানের একপাশে তুলসীমঞ্চ। একটি বছর দুয়েকের গোলগাল ছেলে দৌড়ে এসে প্রশান্তর কোলে চড়ে বসল। হেসে প্রশান্ত বলল, আমার ছেলে।

দাওয়ার উপর মাদুর পেতে আমাকে বসিয়ে খবর দিতে ভিতরে গেল প্রশান্ত। ফিরে এলে বললাম, কি রে প্রশান্ত, মনে পড়ে সেদিনের কথা?

·পড়ে না আবার! আপনার দয়াতেই এই জীবনটা নতুন করে ফিরে পেয়েছি। পুরনো দিনের কথা ভাবলে এখনও গা'টা ঘিন ঘিন করে ওঠে। এখন আমি ভাল আছি। একটু থেমে বলল, মাঝে মাঝে অবশ্য হাত নিস্‌পিস্‌ করে। কি লাভ এত খাটুনীতে?

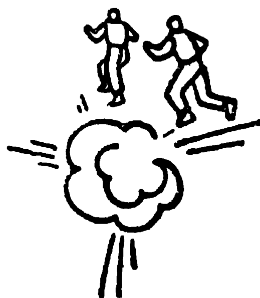
একটি রেকাবীতে দুটি মিষ্টি দুটি সিঙাড়া আর এক গেলাস জল আমার সামনে রেখে লক্ষ্মীর মত বৌমা আমাকে প্রণাম করে বলল, হাত ধুয়ে একটু মিষ্টিমুখ করুন কাকাবাবু। ও আপনার কথা আমাকে রোজই বলে। আমি চা নিয়ে আসছি।

প্রশান্তর দিকে চেয়ে হেসে বললাম, কি রে হতভাগা, লাভ কি কিছুই হয় নি?

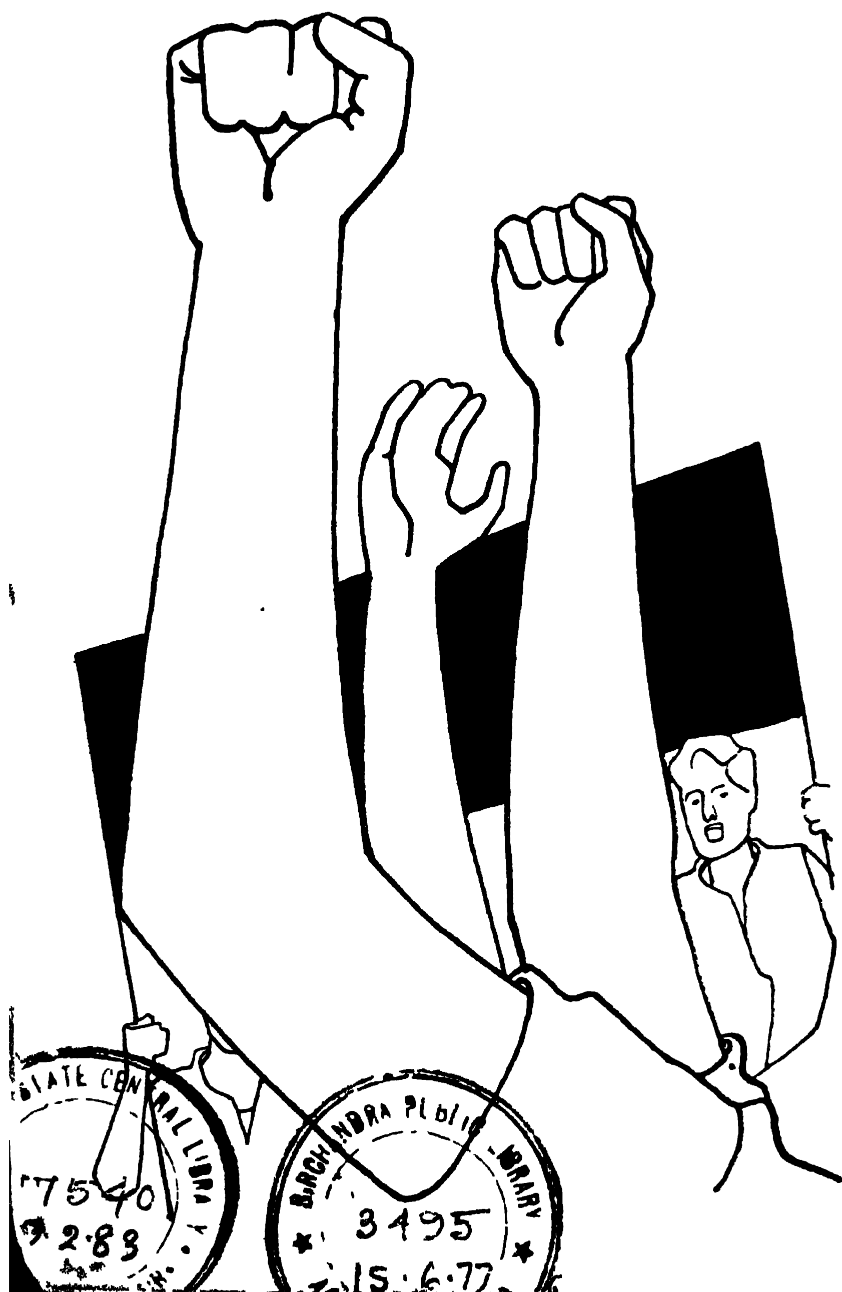
প্রশান্ত উত্তরে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

দু' বছরের শিশুর কলহাস্যে ছোট গৃহখানি ভরে উঠল।

এই রকম কত প্রশান্ত হয়তো শেষ হয়ে গেছে। প্রিয়তম স্বামী হয়েছে ওয়াগন-রেকার, স্নেহশীল পিতা হয়েছে তার-কাটা। এদের করার কি অন্য কিছুই নেই? হয়তো আছে··· হয়তো নেই···এ সবের দায়িত্ব নেতাদের, রাষ্ট্রপ্রধানদের। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা শুধু ভাববো আর ভাববো।



এ লড়াই বাঁচার লড়াই



নাঃ, দু'দণ্ড যে লোকের পাশে বসে একটু সুখ-দুঃখের কথা বলব তারও উপায় নেই, জোড়ায় জোড়ায় সব বসে আছেন, বিরক্ত হয়ে সৌরেন বলে ওঠে,—একটু শালীনতাবোধও নেই।

হেসে বলি, ওদের ওপর তোমার শুধু রাগই হলো, দুঃখ হলো না! হয়তো ওরা তোমার কাছে কিছুটা সহানুভূতি পেতে পারে।

জানো, আমাদের পাড়ার একটি ছেলে জয়ন্ত আর একটি মেয়ে সীমা, দু'বন্ধুর ছেলে-মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই ঠিক ছিল ওদের বিয়ে হবে, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে একদিন বাস দুর্ঘটনায় সীমার বাবাকে অকালেই পরপারে পাড়ি দিতে হলো, আর জয়ন্তর বাবা চিরকালের মত হয়ে রইল পঙ্গু।

দিনের পর দিন গড়িয়ে যায়, সবাই ভুলে যায় সীমা আর জয়ন্তর কথা, কিন্তু শিশু-মনের ছাপ যৌবনেও মুছে যায় না। তারা দু'জনই দু'জনের কাছে এগিয়ে আসে, একে সান্ত্বনা খোঁজে অপরের কাছে।

সীমা তবু একটা চাকরী জুটিয়ে নিয়ে সংসারটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, জয়ন্ত বোধ হয় তাও পারে না। হতাশ হয়ে জয়ন্ত সীমাকে বলে, আজও কিছু হলো না সীমা, বাঁচার তাগিদে হয়তো আমাকে ওয়াগন-ব্রেকারদের দলেই ঢুকে পড়তে হবে—

ওর মুখ চাপা দিয়ে সীমা বলে ওঠে, তোমার মাথাটা-একদম খারাপ হয়ে গেছে, চাকরী ছাড়া কি বাঁচার আর কোন পথ নেই?

আছে, ব্যবসা; হতাশ হয়ে বলে জয়ন্ত; কিন্তু তার জন্য চাই টাকা—চাই অভিজ্ঞতা।

বাধা দিয়ে সীমা বলে ওঠে, না, পুরুষকার, দেখ আমার কাছে এই মাইনের টাকাটা আছে, তুমি নাও।—ব্যগ্রভাবে হাতটা জড়িয়ে ধরে বলে, যা হোক কিছু একটা আরম্ভ করো জয়ন্ত, আমি আর সইতে পারছি না।

পাগলের মত কথা বলো না সীমা, তোমার ঐ ক'টি টাকাই তো ওদের ভরসা।

লক্ষ্মীটি, অমন করো না, হাতটা চেপে ধরে বলে, আমার কথাটা একবার ভাব তো, তুমি না দাঁড়ালে আমি কি নিয়ে বাঁচব ?

ঠিক আছে, গোটা পঁচিশেক টাকা দাও, ফেরি করে সবজি বিক্রি করব।—একটু থেমে বলে, সাহস পাচ্ছি না সীমা, হয়তো তোমার টাকাটাও নষ্ট করে ফেলব।

জয়ন্তকে ভরসা দিয়ে সীমা বলে ওঠে, কাল আমার ছুটি জয়ন্ত, আমি তোমার পাশে থাকব, তোমায় সাহস যোগাব।

* * * *

পরের দিন একটা ঝাঁকায় করে কয়েকটা কুমড়ো, লাউ, বেগুন নিয়ে জয়ন্ত বেরিয়ে পড়ে, সঙ্গে চলে সীমা। পথ দিয়ে চলছে কোনও একটা প্রতিষ্ঠানেব ধর্মঘটি মিছিল—'এ লড়াই বাঁচাব লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।' জয়ন্ত এ প্রতিষ্ঠানের লোকদেব চেনে। কিছুদিন আগে ইনটারভিউ দিতে গিয়েছিল ওদেরই অফিসে। সীমাকে বলে জয়ন্ত, জানো সীমা, এদের কারও মাইনে পাঁচশো টাকার কম নয়, তবু বাঁচাব অধিকাব যেন এদেরই আছে, আমাদের নেই······।

ম্লান হেসে সীমা বলে, না, বাঁচার অধিকার আমাদেরও আছে, তবে বলার কেউ নেই।

সত্যি বলেছ, বেকারদের জন্য নেতাদের ভাববার অবকাশ কোথায় ? কেউ বলে না সীমা, মাইনে বাড়ানো বন্ধ করে বেশী লোককে চাকরী দাও। এদিকে বড় বড় কথা বলি—ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে হবে, আর অন্যদিকে ব্যবধান বাড়ানোর দাবীকেও ন্যায্য বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করি না, জনপ্রতি দশ টাকা মাইনে বাড়ানোর চেয়ে একটি বেকার ভাইয়েব চাকরী অনেক বেশী কাম্য।

ওকে থামিয়ে দিয়ে সীমা বলে ওঠে, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে জয়ন্ত! তোমাদের চাকরী হলে, সেখানে কোন্ পার্টির ইউনিয়ন

আছে, কে জানে? তার চেয়ে যে কোন প্রতিষ্ঠানে পাঁচ-দশ টাকা মাইনে বাড়লে ভোটের সময় সুবিধা হবে।

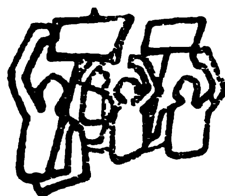
ঠিক কথাই বলেছ সীমা, ঘুষ সবখানেই চলছে।

হঠাৎ মিছিলের একজনের সঙ্গে ধাক্কা খায় জয়ন্ত। ঝাঁকা থেকে সব ছড়িয়ে পড়ে পথে।

গালাগালি করে ঝাঁজিয়ে ওঠে মিছিলের প্রগতিশীল জনগণের একাংশ। সীমাকে লক্ষ্য করে দু-একজনের খিস্তি-খেউড় করতেও বাধে না।

পায়ের চাপে পিষে নষ্ট হয়ে যায় লাউ, কুমড়ো আর বেগুন-গুলি, তার সঙ্গে গুঁড়িয়ে যায় ভবিষ্যৎ-এর আশা। ঝাপসা চোখে সেগুলিকে কুড়োতে যায় জয়ন্ত। মাথাটা ঘুরে ওঠে ··মিছিলের একটা কথাই কানে ভেসে আসে—'এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।'

জানো সৌরেন, লেকের ধারে ঐ দু'টি ছেলে-মেয়ে হয়তো সীমা আর জয়ন্ত···আজ তারা কোথায় হারিয়ে গেছে জানি না, হয়তো তারা ঘর বাঁধতে পারত। হয়তো গড়তে পারত আদর্শ পরিবার। নেতাদের, সমাজ-সংস্কারকদের এদের দিকে তাকাবার সময় নেই। আর আমরা—না—আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা কি করতে পারি? আমরা শুধু ভাববো আর ভাববো।



ইয়াহিয়া কি কোলকাতায় এসেছিল ?



বুঝলি রে, ইয়াহিয়া খাঁ নিশ্চয়ই কলকাতা এসেছিল!

চারমিনারে সুখটান মারিয়া পট্‌লা ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, কি করে বুঝলে চাঁদ? তোমার সঙ্গে দেখা করেছিল নাকি?

বিজ্ঞের মত ভঙ্গি করিয়া ফট্‌কে বলিল, আরে বোঝা কি এতই কঠিন। দে, ছাড় দেখি একটা চারমিনার।

ধেংত্তেরি—এই নে, আর পারিনে বাপু, নে—এবার গুল ঝাড়।

একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া ফট্‌কে বলিল, আরে বলছি বাবা বলছি, গুছিয়ে লিখে রাখিস, কপালে লেগে গেলে, দু'চার টাকা মিনি পত্রিকার কাছ থেকে বাগিয়ে নিতে পারবি।

ঠিক আছে, আব দব বাড়াসনে—

তবে শোন, ইয়াহিয়া ভুট্টোকে বলছে—দোস্ত, মুজিবের অবস্থাটা কি রকম বুঝছ?

দাঁত খিঁচাইয়া পট্‌লা কহিল, আরে দূর, কবে? কোথায়? কখন? সেটা বলবি তো?

সে ঠিক আছে, তোর মন-মতন একটা আস্তানা বসিয়ে নিস! নে, আর বাগড়া দিস্ নে, মন দিয়ে শোন, বলিয়া আর একটা চারমিনার বাহির কবিতে করিতে বলিতে শুরু করিল, ভুট্টো জবাব দিল—আরে কলকাতায় এ্যাদ্দিন থেকেও কি বাঙ্গালী জাতটাকে চিনতে পারো নি খাঁ-সাহেব। আবে বাবা, একই জল-হাওয়ায় মানুষ, ধর্ম আলাদা হলেও চবিত্র যাবে কোথায়? দেখতে পাচ্ছ না, কতগুলি দল ইলেকশানে দাঁড়িয়েছে, সিঙ্গল পার্টি মেজরিটি কেউ পাবে না—বুঝলে? দেখবে ছোট দলগুলিই ব্যালান্সিং পাওয়ার হয়ে মন্ত্রিত্ব চালাচ্ছে। বুঝলে খাঁ-সাহেব, আমবা যা চাইছি, তাই।

না হে, ভুট্টো সাহেব, আমবা মিলিটারীব লোক, শত্রুকে এত ছোট কবে দেখি না। ধবো, মুজিবরেব দল যদি সত্যিই মেজরিটি পেয়ে যায়?

আরে দূর, তাতেই বা হয়েছে কি? তোমার ভয় তো ঐ ছয় দফায়? সে দেখো মুজিব ঠিক ঐ ছ'দফার দফারফা করে সিধে

মন্ত্রিত্বের গদিতে বসে পড়েছে। আশ্বাস দিয়ে আবার বলতে শুরু করে, আরে বাঙ্গালীরা জানে ইলেকশানের সময় ঐ সব অনেক কিছুই বলতে হয়, পরে কেউ মনে রাখে না। যারা জেতে তারা তো না-ই, যারা ভোট দেয় তারাও না। যেটুকু মনে রাখে তা হলো গিয়ে অপোজিশন পার্টির লোকেরা—তবে নিজেদের কথা ভেবে তারাও বেশী ঘাঁটায় না।

না হে ভুট্টো…মুজিবটা যা গোঁয়ার, যদি ছ'দফা না ছাড়ে?

আরে এতেই তুমি ভয় পাচ্ছ? হাঃ হাঃ হাঃ, আরে এখানে দেখছ না, একটা লোক দিনের বেলায় হাজার হাজার লোকের সামনে আরেকটা লোককে খুন করে হেঁটে চলে যাচ্ছে, সবাই দেখেও না দেখার ভান করে। আরে ভেতো বাঙ্গালীরা একটা মহাভীরুর জাত, অস্ত্র দেখালে এরা ইঁদুরের গর্ত খোঁজে। তবে হ্যাঁ, যদি একান্তই টালবাহানা করে, তবে দু'দিন গুলি চালালেই দেখবে সব ঠাণ্ডা……।

সাবাস, পিঠ চাপড়ে ইয়াহিয়া বলে ওঠে, এ কথাটা আমার মনে হয়নি।

পটলার পকেট হইতে আর-একটি চারমিনার বাহির করিয়া লইয়া ফটকে বিজ্ঞের মত বলে, এর পরই পঁচিশে মার্চ ইয়াহিয়ার সেই খেল্। এরপরও কি ইয়াহিয়ার কলকাতায় আসা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে?

থাম্ শ্লা, খুব হয়েছে, সিগারেটগুলি তো সব ঝেড়ে দিলি। নে, তাড়াতাড়ি চল, পেটোগুলি ম্যানেজ করে আসি। যে ক'টা টাকা পাওয়া যায়!

বুদ্ধিজীবী



ছেলেরা পাইকারী হারে নকল করে চলেছে।

দেখেও না-দেখার ভান করে যাচ্ছে গার্ড। কেউ কেউ উড়ো-চিঠি পেয়ে, বসে আছেন সিক লিভ্ নিয়ে। প্রাণের মায়া তাঁদেরও কম নয়। দুর্গা দুর্গা করে ফাঁড়াটা কেটে গেলে অনেকে হয়তো কালীবাড়ী ছুটবেন পুজো দিতে, কেউ বা গঙ্গায় যাবেন স্নান করে শুদ্ধ হতে।

একদিন একটি ছেলেকে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা খোকা, নকল করে পাস করে কি লাভ? শিক্ষার মান তোমরা কোথায় নামিয়ে ফেলেছ, বুঝতে পারছ না?'

উত্তরে ছেলেটি বলল, 'কি লাভ? যদি কোনদিন চাকরি মেলে, তখন ঐ পরীক্ষা-পাসের ছাপটার একটা দাম থাকে। আর বিদ্যাবুদ্ধির কথা বলছেন? ছ'মাস পরে আপনাদের মুখস্থ করে পাস-করা একটি ভাল ছেলে, আর নকল করে পাস-করা আমাকে যাচাই করে দেখবেন, বিদ্যার বহর দু'জনেরই সমান।'

একটু থেমে আবার বলে, 'গোটা বইটা পড়েও বহু ছেলে পরীক্ষা খারাপ করে, আবার দেখুন, গোটা কয়েক প্রশ্ন মুখস্থ করে অনেক ছেলে ভাল রেজাল্ট করে বেরিয়ে যাচ্ছে। বুঝলেন স্যার, এ যুগটা বুদ্ধির……। কি স্যার, চুপ করে রইলেন যে, কিছু বলবেন?'

জবাব দিতে পারিনি। শিক্ষকরাও কি তাঁদের আদর্শ মেনে চলছেন? জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ ঘুণ ধরেছে। শিক্ষার মাধ্যমেই হয়তো প্রচণ্ড রকমের একটা ভুল বাসা বেঁধে আছে। এরই বিস্ফোরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি চারধারে—সমাধানের দায়িত্ব নেতাদের, দায়িত্ব সরকারের; আমরা সাধারণ মানুষ—হয়তো কখনো কখনো শুধু ভাববো আর ভাববো।

বরপ্রাপ্তি



(স্থান—কৈলাশ পর্বত। সময়—সায়াহ্ন)

অন্দর মহলে ভীষণ গণ্ডগোল, দেবীর মর্তে গমনের সময় হইয়াছে। এবার গজে গমনের নির্দেশ, কিন্তু এখনও গজের বন্দোবস্ত হয় নাই। এদিকে তাড়াতাড়ি যাত্রা না করিলে ৺পূজার পূর্বে পৌছানো সম্ভব নয়। পতি দেবতার গাঁজা-ভাঙের টান পড়ায় মেজাজ যাহা হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে গজের সন্ধানে পাঠাইবার কথা স্বয়ং দেবীও কল্পনা করিতে পারেন না।

কার্তিক বোমা ছুড়িবার কায়দা রপ্ত করিতে ব্যস্ত। গণেশ পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি দেখিয়া ওপথে পা বাড়াইতে চাহিতেছেন না। জন্মেব পব একবার গলদেশ কর্তিত হইবার পর হইতেই তাঁহার গলদেশের ভয় এখনও কাটে নাই ; তদুপরি গজেন্দ্রগমনে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই মাতৃদেবীর মুখের উপব অনিচ্ছা সাফ জানাইয়া দিয়াছেন।

এদিকে সবস্বতী পুলিস পাহারার সুবন্দোবস্ত থাকিবে কিনা জানাইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বার্তা পাঠাইয়াছিলেন। এইমাত্র বার্তাবাহক সংবাদ আনিয়াছে, পুনরায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি রাজ্যপালকে দেওয়া হইবে, না কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে দেওয়া হইবে, ঠিক করিতে না পারিয়া বার্তাবাহক ফেরত আসিয়াছে।

লক্ষ্মীদেবী মাতৃদেবীকে জানাইয়াছেন ৺পূজায় তিনি বাংলায় যাইবেন না। সেখানে ধর্মের ঘট চলিতে থাকিলেও লক্ষ্মীর ঘট উলটাইয়া গিয়াছে। তিনি বরং অ্যামেরিকাটা ঘুরিয়া আসিবেন। একমাত্র সেখানকার সরকারই লক্ষ্মীর জন্য জনমতকে কদলী দেখাইয়া, মানবিকতা ও নীতিবোধ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। এহেন ভক্তের দেশে না যাইয়া ৺পূজার ছুটি তিনি নষ্ট করিবেন না।

গৃহের এমত অবস্থায় গঞ্জিকায় শেষ টান মারিয়া দেব দীর্ঘ-

নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলিয়া ফেলিলেন, 'সংসার অরণ্য।'

নিঃশেষিত কলিকাটির দিকে তাকাইয়া নন্দী সায় দিয়া বলিয়া উঠিল, 'যা বলিয়াছেন কর্তা, বাঁচিয়া আর সুখ নাই।'

এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভৃঙ্গী আসিয়া বার্তা নিবেদন করিল, 'দেব, পাহাড়ের পাদদেশে এক ব্যক্তি আপনাকে প্রাণপণে ডাকিতেছে, আর পাথরের নুড়িতে মাথা খুঁড়িতেছে, সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কারণবারি এবং গঞ্জিকা দেখিয়া মনে হইল জিনিসগুলি আগ্ মার্কা –রাজস্থান মার্কা নহে।'

পুলকিত হইয়া ঢুলু ঢুলু নেত্রে হাতজোড় করিয়া নন্দী কহিল, 'দেব, এই দুর্দিনের বাজারে এতগুলি স্বর্গীয় জিনিস হাতছাড়া করা ঠিক হইবে? ভক্তকে দর্শন দিয়া প্রণামী লইয়া আসুন—আমরাও প্রসাদ পাইয়া বাঁচি।'

সিদ্ধির ভাণ্ডটি শেষ করিয়া দেব উদাসভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'তবে তাহাই হউক।' তারপর নন্দীকে বলিলেন, 'অন্দর মহল হইতে নূতন একখানা ব্যাঘ্রচর্ম লইয়া আইস, এইখানা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর ভাল কথা, দেবীকে বলিয়া রন্ধনগৃহ হইতে কিছু ভস্ম লইয়া আসিতে ভুলিও না।'

নন্দী অন্দর মহলে প্রবেশ করিলে দেবাদিদেব ভৃঙ্গীকে তাহার ত্রিশূলটা আনিতে বলিলেন। নন্দী আসিয়া বলিল, 'দেব, ব্যাঘ্রচর্মটি মা বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। তিন দিন অরন্ধনের দরুন রন্ধনাগারে ভস্মের লেশমাত্রও মিলিল না। তবে আমি বুদ্ধি করিয়া প্লাষ্টিকের পরদাটা মা'র অলক্ষ্যে লইয়া আসিয়াছি এবং সরস্বতীর ডিবা হইতে কিছুটা শ্বেতচূর্ণও আনিয়াছি। ইহার দ্বারাই মোটামুটি কাজ চালাইয়া লউন—ভক্ত নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া আছেন, ভেজাল ধরিতে পারিবেন না।'

ভৃঙ্গী পুরনো জং-ধরা ত্রিশূলটি লইয়া আসিয়া বলিল, 'দেব, নূতন ত্রিশূলটি কার্তিক-দাদা পাইপগান বানাইতে লইয়া গিয়াছেন, আমি ধুতুরা বন হইতে পুরনোটি অতি কষ্টে উদ্ধার করিয়া

আনিয়াছি। আপনি ইহাই হস্তে ধারণ করুন।'

আরক্ত নেত্রে দেবাদিদেব বলিলেন, 'ঠিক আছে।'

যথাসময়ে সুসজ্জিত হইয়া দেবাদিদেব ভক্তকে দর্শন দিতে চলিলেন। ভৃঙ্গী প্রথমে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল। ঘোর অন্ধকার। বারংবার হোঁচট খাইয়া দেবাদিদেব বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'চন্দ্রের কি হইল? এমনিতেই মাসের অর্ধেক বিশ্রাম, তাহাতেও কর্তব্য কর্মে এত অবহেলা! নাঃ, উহাকে আর চাকুরীতে রাখা চলিবে না।'

বাধা দিয়া নন্দী বলিয়া উঠিল, 'সর্বনাশ কর্তা, ওটি করিতে যাইবেন না। উহারা ইউনিয়ন করিয়াছে, সমস্ত দাবী-দাওয়া না মানিলে আর কোনোদিন আলো জ্বলিবে না—ক্ষুণ্ণ হইবেন না, আমরা প্রায় আসিয়া পড়িয়াছি, ঐ শুনুন ভক্তের কাতর আহ্বান!'

ভক্তটি পাথরের নুড়ির উপর মাথা খুঁড়িতেছে, মাঝে মাঝে মত্তকণ্ঠে চিৎকার, 'ব্যোম্ ভোলানাথ'—পাশে গঞ্জিকার কলিকা হইতে মৃদু মৃদু ধূম্র উদ্গীর্ণ হইতেছে। পাত্রে অর্ধেক কারণবারি পড়িয়া রহিয়াছে।

ভক্তকে দেখিয়া বিগলিত চিত্তে দেবাদিদেব অভয় বাহু বিস্তার করিয়া কহিলেন, 'বৎস, আমি প্রীত হইয়াছি, বর প্রার্থনা করো।'

রক্তচক্ষু উন্মীলন করিয়া ভক্তটি ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'দেব, দয়া যখন করিলেন, তখন এমন বর দিন, যাতে কাজ না করিলেও আমার চাকুরী না যায়। চুরি-জোচ্চুরি, রাহাজানি, খুনখারাপি করিয়াও যেন সমাজের মাথা হইয়া থাকিতে পারি।'

দেবাদিদেব বলিলেন, 'তথাস্তু'। তারপর চুপি-চুপি বলিলেন, 'তুই যে-কোনো একটা রাজনৈতিক দলে নাম লিখাইয়া ফেল। আর মতে না মিলিলেই তাহাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া জোর গলায় প্রচার চালাইয়া যা'।—বলিয়াই অবশিষ্ট বোতলগুলি নন্দী-ভৃঙ্গীর হাতে দিয়া গঞ্জিকার ভাণ্ডটি নিজ হস্তে লইয়া সশিষ্য অন্ধকারে মিলাইয়া গেলেন।



'ধনা, কল্‌কেটা আর একবার সাজ।'

'ধুত্তরি, খালি কল্‌কে সাজ আর কল্‌কে সাজ—তোমার সেই গল্পটা শেষ করবে না?'

'আরে গল্প নয় পাষণ্ড, গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। এ বাবার জিনিস'—বলে কল্‌কেটা মাথায় ঠেকিয়ে, ভাল করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে গজানন বলল, 'বুঝলি হারাণ, বাংলা সাল হলো গিয়ে ১৩৯০, আর ইংরাজী ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ। তারিখটা ঠিক মনে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষের ঘরে বসে আছি। হঠাৎ একদল লোক হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকেই সটাসট চেয়ারগুলির চারধারে দাঁড়িয়ে গেল।'

চম্‌কে উঠে অধ্যক্ষ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার?'

সামনের ঢেঙ্গাপানা লোকটা ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'আপনাকে ঘেরাও করলাম স্যার।'

নির্বিকারভাবে অধ্যক্ষ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কারা?'

উত্তর হলো, 'আমরা ছাত্র।'

ছাত্রদের এক একজনের বয়স পঁয়ত্রিশ, কারও চল্লিশ, কারও হয়তো বা তার চাইতেও বেশী। কমবয়সী দু-একটি ছেলে যে ছিল না—তাও না। দেশী কারণবারির গন্ধে স্থানটি আমোদিত।

অধ্যক্ষ বললেন, 'ভাল কথা! ঘেরাও তো করলে, কিন্তু অপরাধটা কি?'

সমস্বরে সবাই বলে উঠল, 'আমাদের দাবী মানতে হবে।'

'তথাস্তু, কিন্তু কিসের দাবী জেনে রাখাটা ভাল নয় কি?'

ঢেঙ্গা লোকটি চোঙ্গা প্যাণ্ট-পরা ছেলেটিকে লক্ষ্য করে বলল, 'পট্‌লা, দাবীগুলি চটপট জানিয়ে দে।'

'এখুনি জানিয়ে দিচ্ছি গুরু,' বলেই প্যাণ্টের পকেটগুলি খুঁজে কোমরের গেঁজে থেকে একখানা তেল-চিটচিটে কাগজ বের করে বলল, 'পড়বো গুরু?'

'হ্যাঁ, পড়।'

'তাহলে শুনুন, স্যার—

(এক)—আমাদের চার মাসের বোনাস চাই।

(দুই)—বিনা ভাড়ায় কোয়ার্টার চাই।

(তিন)—বছরে তিন মাসের সবেতন ছুটি চাই।

(চার)—পুত্রকন্যার শিক্ষাভাতা চাই।

(পাঁচ)—বিধবা স্ত্রীর জন্যে বেতনের ৯০ ভাগ পেনসন চাই।

(ছয়)—... ... ...'

'ব্যস্—ব্যস্, আর বলতে হবে না—সব মঞ্জুর।'

ঢেঙ্গা লোকটি বলে উঠল, 'তাহলে এখানে একটা সই করে দিন স্যার।'

অধ্যক্ষ সই করতে উদ্যত হলে চোঙ্গা প্যান্ট মার্ মার্ করে বলে উঠল, 'বাংলায় স্যার, বাংলায়।'

অধ্যক্ষের স্বাক্ষর হবার সঙ্গে সঙ্গে, 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে ঘরটি মুখরিত হয়ে উঠল।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঢেঙ্গা লোকটি দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'এই গবা, চিল্লাতে হবে না, তাড়াতাড়ি চ, সিনেমা হলে মিটিং করতে হবে না?'

'হ্যাঁ রে, টপ গিয়ারে চল্। অ্যাই শম্ভু, তোর তো আবার মালিক পক্ষের বায়না। এবার যেন আবার ভুল করিস না। সামনে থেকে আমি সোডার বোতল ছুড়ব পিছনে পাব্লিকের দিকে, আর তুই ওদিক থেকে ছুঁড়বি পিছনে পুলিসের দিকে, সেবারের মত আবার যেন সেম্ সাইড করিস না।'

'এ্যাই গবা, ওপেন জায়গায় ট্রেড সিক্রেট ফাঁস করছিস? গাঁট্টা মেরে বদন বিগড়ে দেব শালা—'

যেতে যেতে গবা বলে উঠল, 'যেতে দাও গুরু, উনি কি আর আমাদের লাইনের লোক? জানলো তো বয়েই গেল।'

আমিও আর দেরী না করে কল্‌কেটি আর তার আনুষঙ্গিক মাল-মসলা নিয়ে কাঠফাটা রোদে বেরিয়ে এলাম। নিরিবিলি দেখে

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের একটা গাছের ছায়ায় বসে এক ছিলিম টেনে ব্যোম হয়ে বসেছিলাম। কখন যে বেলা পড়ে গেছে কিছুই বুঝতে পারিনি। হঠাৎ চোখে পড়ল, ফেষ্টুনে-ফেষ্টুনে মাঠ ভরে গেছে। চোখটা মুছে নিয়ে পাশের চানাচুরওয়ালাকে ব্যাপারটা কী ডেকে জিজ্ঞেস করতেই সে অবজ্ঞার সঙ্গে আঙুল দিয়ে সামনের ল্যাম্পপোষ্টটার উপরকার পোষ্টারটা দেখিয়ে দিয়ে খদ্দেরের আশায় ভিড়ের দিকে চলে গেল।

পোষ্টার দেখে বোঝা গেল, আজ সারা বাংলা বৈপ্লবিক ছাত্র সম্মেলন। দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল।

'হ্যালো!—ওয়ান—টু—থ্রি—হ্যালো—হ্যালো—' মাইক ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে কঁকিয়ে উঠল। হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।...

তারপর মাইকে ভেসে এল—'বন্ধুগণ, এবার আমাদের সভার কাজ শুরু হবে। আপনারা শান্ত হয়ে. বসুন—প্রথমে উদ্বোধন সঙ্গীত—।'

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর আবার মাইকে ভেসে এল, 'বন্ধুগণ, আমাদের সভার পরিচালনার জন্য আমি সভাপতি হিসাবে বিশিষ্ট চিত্রাভিনেতা অলোককুমারের নাম প্রস্তাব করছি।'

'আমি সমর্থন করছি।'

সমবেত হাততালির মধ্যে অলোককুমার টুইষ্ট নাচের ভঙ্গিতে সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন।

শিল্পীসুলভ ভঙ্গিতে আরম্ভ করলেন, 'বন্ধুগণ, আসুন আমরা সকলে তিরিশ সেকেণ্ড নীরবে দাঁড়িয়ে, যাঁরা এবছর আমাদের কাছ থেকে চলে যাবেন, তাঁদের প্রতি আমাদের শোক নিবেদন করি।'

ষ্টপ্‌ওয়াচ ক্লিক্ করে উঠল। ঠিক তিরিশ সেকেণ্ড পর সভাপতি বললেন, 'আপনারা বসতে পারেন।'—একটু পরে আবার বললেন, 'এবার আপনাদের কাছে বিপ্লবীবন্ধু গাত্রদাহ তলোয়ারকর ভাষণ দেবেন।'

তুমুল হাততালির মধ্যে গাত্রদাহ মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'আমার বিপ্লবী, মেহনতী বাংলার ছাত্র বন্ধুগণ, আজ আমাদের সামনে এক বিরাট পরীক্ষা। এ আমাদের বাঁচার লড়াই—ইতিহাস আমরা মানি না—কিন্তু ইতিহাস না মানলেও ইতিহাস আছে—থাকবে। কিন্তু আমাদের কী পরিচয় থাকবে এই ইতিহাসের পাতায়? বলতে পারেন?—পারেন না।

'১৩৮০ সনের পর থেকে আজ পর্যন্ত আপনারা কোনো বিক্ষোভ মিছিল বার করতে পারেননি। পারেননি একটা ধর্মঘট করতে। বাংলার গণতন্ত্র কি শেষ হয়ে গেছে? প্রতিবাদের ভাষা কি বাংলায় নেই?

'হ্যাঁ, আপনারা কি বলবেন আমি জানি। আপনারা বলবেন, আপনারা কি করে ধর্মঘট করবেন? আপনাদের কথামত স্কুল-কলেজ খোলে, বন্ধ হয়। আপনাদের নির্দেশের ওপর পরীক্ষায় পাশ-ফেল নির্ভর করে। আপনাদের ইচ্ছানুসারে শিক্ষকদের নিয়োগ-বদলী আর বেতন বৃদ্ধি হয়।

'আপনারা বলবেন, আপনারা পুঁজিপতি কর্তৃপক্ষের কাছে যা দাবী করেন, প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃপক্ষ তার চেয়ে বেশী দিয়ে থাকে।

'কিন্তু বন্ধুগণ, ভেবে দেখেছেন কী—এই প্রতিক্রিয়াশীল ধনিকবাদ আপনাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

'আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর যখন বাংলার এই বিপ্লবী ছেলেদের ইতিহাস লেখা হবে, তখন সমস্ত পৃথিবী জানবে, ১৩৮০ হতে ১৩৯০ সাল পর্যন্ত বাংলার ছাত্রসমাজ অত্যন্ত অনগ্রসর ছিল। তারা প্রতিবাদ করতে ভুলে গিয়েছিল; তারা একটা ধর্মঘট পর্যন্ত করতে পারত না। ছাত্র-প্রগতির ইতিহাসে আমাদের যুগ থাকবে কালিমালিপ্ত হয়ে।'

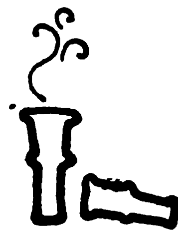
এক চুমুক জল খেয়ে ওলোয়ারকর আবার বলতে থাকেন, 'বন্ধুগণ, হয়তো তখন আমরা অনেকেই জীবিত থাকব। আমাদের

উত্তরপুরুষগণ আমাদের দেখে হাস্যকৌতুক করবে—বন্ধুগণ, সেই ভয়ঙ্কর দিনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

'বন্ধুগণ, এই গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য আমি সারা বাংলার বৈপ্লবিক ছাত্র সংস্থার পক্ষ থেকে একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব করছি: ধর্মঘটের সুযোগ দিতে হবে—আমাদের সব দাবী মানা চলবে না।'

'হিয়ার, হিয়ার'—তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

সভাস্থল আলোড়িত করে ধ্বনি উঠল: বিপ্লবী ছাত্রসমাজ জিন্দাবাদ!



আমি মন্ত্রী হব না



সাত হাত লম্বা নাকে খত দিয়াছি, আর মন্ত্রী হইব না। যথেষ্ট আক্কেল হইয়াছে, আর নয়। কি কুক্ষণে পাড়ার ছেলেদের ক্লাবে এক শত টাকা চাঁদা দিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, হয়তো সভাপতি বা সহ-সভাপতি ধরনের একটা কিছু করিবে···কিন্তু এ যে বাবা একেবারে মন্ত্রী···

তবে শুনুন মশাই···

গদাইবাবু বাড়ী আছেন? গদাইবাবু?—পাড়ার ছেলের দল বাড়ীর কড়া নাড়িতে লাগিল।

গেঞ্জিটা গায়ে চড়াইয়া কাছা-কোঁচা সামলাইতে সামলাইতে বসিবার ঘরটা খুলিয়া দিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, আরও কিছু গচ্চা যাইবে। হুড়মুড় করিয়া পঙ্গপালের মত পাড়ার ছেলেরা ঘরে ঢুকিয়াই কাড়াকাড়ি করিয়া পায়ের ধূলা নিতে লাগিল।

ভক্তির বহর দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিলাম, কী ব্যাপার হে?

দেখুন স্যার, আমাদের বিমুখ করবেন না, কথা দিন!

কী ব্যাপার না জেনে···

আপনাকে আমরা কিছুতেই ছাড়বো না স্যার, কথা আপনাকে দিতেই হবে।

অনন্যোপায় হইয়া বলিলাম, আচ্ছা বাবা, কথা দিলাম।

হুর্‌রে—গদাইবাবু কী জয়, গদাইবাবু কী জয়!—বলিয়া সোল্লাসে ছেলেরা লাফাইতে লাগিল।

একটু ঠাণ্ডা হইলে একটি ছেলে বলিয়া উঠিল, স্যার, আপনাকে ইলেক্‌সনে দাঁড়াতে হবে!

বলো কি হে? হঠাৎ ইলেক্‌সনে দাঁড়াতে যাব কেন? আর লোকেই বা আমাকে ভোট দেবে কেন?

সে-সব স্যার আমাদের ব্যাপার, আপনি সেরেফ নমিনেশান পেপারটা সই করে দিন, আমরা ফর্ম নিয়ে এসেছি।

সে কি হে? এদিকে তো দাঁড়াচ্ছে ও পার্টির দুর্যোধন পাইন

আর এ পার্টির শ্যামসুন্দর বরাট।

আপনাকে ভাবতে হবে না স্যার। বরাটের ভোটার লিষ্টে নাম নেই, আর দুর্যোধনবাবুর পার্টির এবার আর কোনো চান্স নেই, আপনি স্যার সিওর।

দরজার ফাঁকে গিন্নীর চুড়ির আওয়াজ পাইলাম। ইঙ্গিত বুঝিয়া ভিতরে যাইয়া দেখিলাম, গিন্নীও ছেলেছোকরাদের দিকে।

'মা দুর্গা' বলিয়া ছেলেদের কথা দিলাম, তার সঙ্গে পাঁচশ এক টাকার একটা বাণ্ডিল, প্রথম কিস্তি।

তারপর কিসে যে কী হইয়া গেল, কিছুই বুঝিলাম না। জমা-খরচের হিসাব মিলাইয়া দেখিলাম, বাড়ী বাঁধা পড়িয়াছে, গিন্নীর গয়না দু'চারখানা মাত্র অবশিষ্ট আছে···তবে হ্যাঁ, ছেলেরা কথা রাখিয়াছে। ভোটে আমি জয়লাভ করিয়াছি এবং ডামাডোলের মধ্যে 'ব্যালান্সিং পাওয়ার'-এর ভেলায় চড়িয়া একেবারে মন্ত্রী বনিয়া গিয়াছি।

প্রথম কয়েকদিন অভিনন্দন, কালীবাড়ী, পূজা-পার্বনের মধ্যে মন্দ কাটিল না। এর পরই পড়িলাম ফ্যাসাদে···

গিন্নী তার গয়নার কথা মনে করাইয়া দেয়, ছেলেমেয়েদের নিত্যনূতন আবদার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাই বিমুখ।

কাহারও ছেলের চাকরী, কাহারও বা পারমিট। ইহা ছাড়া আছে হাজার রকমের বায়নাক্কা—এদিকে পাড়ার ছেলেদের ভয়ে তো সিঁটাইয়া আছি—চাকরী, টাকা, আবার থানা থেকে ছাড়িয়ে আনা ইত্যাদি।

কোথাও ইচ্ছামত যাওয়া যায় না। এমন কি সিনেমায় যাইতে হইলেও পুলিশ লইয়া যাইতে হইবে। দু-চারটা চটুল হিন্দি বই দেখিয়া একটু আনন্দ পাইতাম, কিন্তু এখন মিনিষ্টার···আজেবাজে জায়গায় যাই কি করিয়া? মাঝে মাঝে ভাবি, হায়রে জীবন—গড়ের মাঠের ফুচ্‌কা—আঃ···

পাব্লিক বুঝিবে না, আমরা মন্ত্রী হইয়াও যেন কয়েদখানার বন্দী।

এদিকে নির্বাচনী সভায় উনপঞ্চাশ দফা কর্মসূচীর দফারফা করিয়া বসিয়াছি। অফিসের কর্মীরা নিজেদের লইয়াই ব্যস্ত—কাজ গুছাইয়া লইবার সময় ছাড়া ধারেকাছেও আসেন না। ওদিকে অকৃতজ্ঞ জনগণ কর্মসূচী কার্যকরী না হওয়ায় জবাবদিহি করিতে বলে। একবার ভাবি, সাফ সাফ জানাইয়া দিই, নির্বাচনী সভার প্রতিজ্ঞা নির্বাচনের সঙ্গেই কবরস্থ হইয়া যায়—কিন্তু বিশিষ্ট বন্ধুদের অনুরোধে 'ট্রেড সিক্রেট' আর 'আউট' করি নাই।

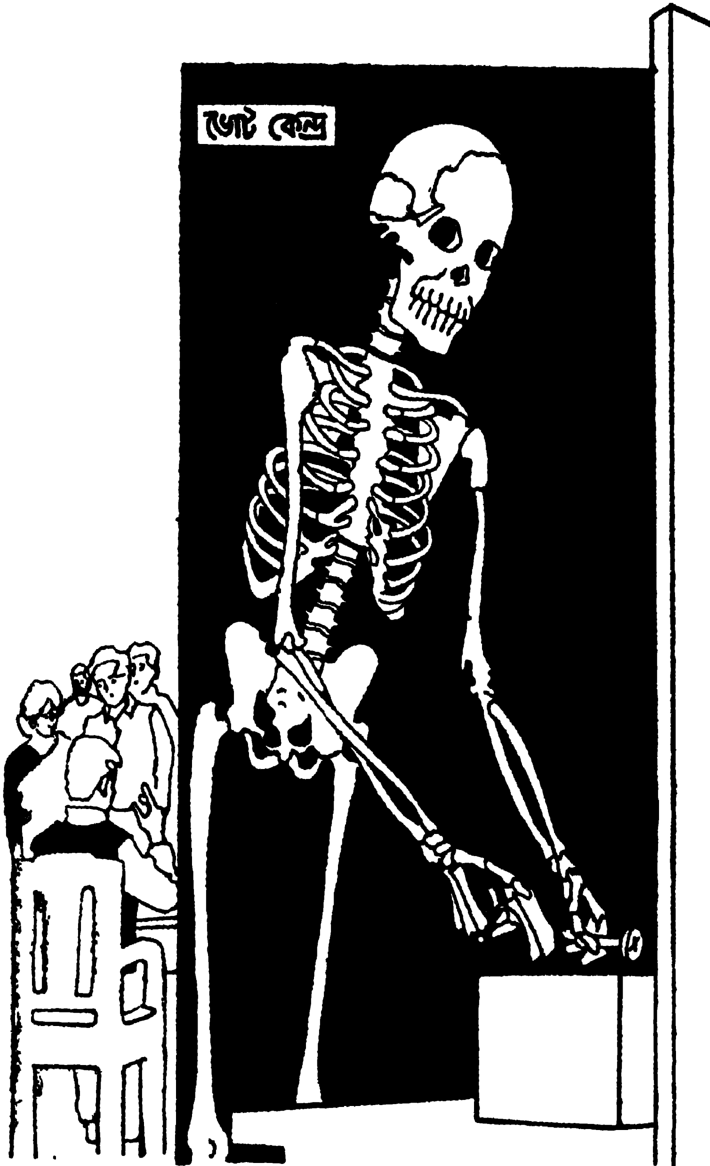
মনের দুঃখ লাঘব করিতে সেদিন এক নবলব্ধ বন্ধুর সঙ্গে পার্ক স্ট্রীটের একটি হোটেলে গিয়াছিলাম। হুইস্কির গ্লাসটি গলায় ঠেকাইয়াছি কি না ঠেকাইয়াছি—পরের দিন খবরের কাগজ দেখিয়া চক্ষুস্থির···একটা প্রাইভেসি পর্যন্ত নাই—সব জায়গাতেই খবরের কাগজের খবরদারী। জীবনের উপর ঘেন্না ধরিয়া গিয়াছে।

একবস্ত্রে সন্ন্যাস লইবার কথাও যে মনে হয় নাই এমন নয়। জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, পুলিশের গাড়ীটি কাছেই রহিয়াছে, মন্ত্রী হইয়া চোরের দায়ে ধরা পড়িতে 'প্রেষ্টিজে' লাগিল। কপাট বন্ধ করিয়া ফ্যানের আংটার সঙ্গে দড়ি ঝুলাইবার বন্দোবস্ত প্রায় পাকা করিয়া ফেলিয়াছিলাম, এমন সময় কন্যার চিৎকারে বাহিরে আসিয়া শুনিলাম, এইমাত্র রেডিওতে প্রচার করিয়াছে, 'মিনিস্ট্রি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।'

আঃ—মনে হইল এত মধুর সংবাদ জীবনে খুব কমই শুনিয়াছি। বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, পুলিশের গাড়ীটিও চলিয়া যাইতেছে।

গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াছি। গিন্নীকে বলিয়াছি, যে কয়খানা গহনা আছে তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাক। আর শাঁখা সিঁদুর যে বাঁচাইতে পারিয়াছ তাহার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। তবে হ্যাঁ—ছেলেকে বলিয়া দিয়াছি—বাড়ীর সামনের 'নেম-প্লেটে' নামের আগে যেন প্রাক্তন মন্ত্রী কথাটা লিখিয়া রাখে।

অমৃতস্য পুত্রাঃ



কোনও একটা প্রতিষ্ঠানের কমপ্লেন সেক্সানে কয়েকজন লোক নেওয়া হইবে শুনিয়া ছেলেটার জন্য তদ্বির করিতে গিয়াছিলাম। কিছুই হইল না, বুঝিলাম ডেফ্ এ্যাণ্ড ডাম্ব হওয়াই একমাত্র কোয়ালিফিকেশন। ঐ স্পেশালিটি না থাকিলে উক্ত বিভাগে চাকুরীর আশা নাই।

অনেক লোকের তোষামোদ করিয়াছি, কিন্তু না—আর নয়। পুরাকালে লোকজন তপস্যায় বিশ্বাস করিতেন এবং উহা দ্বারা নিজের ভাগ্য নিজেরাই পরিবর্তন করিয়া লইতেন। তবে আমিই বা কেন পারিব না?

মন স্থির করিয়া ফেলিলাম। এখন কাহার তপস্যা করি? কালী, দুর্গা, মহাদেব, লক্ষ্মী, সরস্বতী···না—এঁদের ডিমাণ্ড বড় বেশী, সুতরাং দেমাক একটু বেশী হইবে জানা কথা।

এদিকে আমারও সময় কম। প্রায় হাফ-সেঞ্চুরির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছি—চিন্তা করিয়া থৈ পাইতেছি না। এমন সময় হঠাৎ মাথায় এক ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়াতে ব্রেনওয়েভ খেলিয়া গেল—মনে পড়িয়া গেল, দেবরাজ ইন্দ্রের কথা···ঠিক হইয়াছে। প্রায় আমাদের পরিচিত একটি চরিত্র—তারপর দেবতাদের রাজা, এবং পাবলিক ডিমাণ্ডও তেমন নাই, অফুরন্ত সময়। অপ্সরীদের নৃত্যগীত নিয়া মহানন্দে খোস মেজাজে ভদ্রলোক দিন কাটাইতেছেন। অন্য দেবতাদের মত কাটখোট্টাও নয়। হ্যাঁ, মন স্থির করিয়া ফেলিলাম, নৌকা বাঁধিতে হয় তো বড় গাছেই বাঁধিব।

এখন সমস্যা দাঁড়াইল, কোথায় যাই! পাহাড়-পর্বত মুনি-ঋষিরা অলরেডি বুক করিয়া রাখিয়াছেন। এদিকে ট্যাকের অবস্থাও বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক নহে। রেলের টিকিট দুঃসাধ্য, বিমানের ক্ষমতা নাই,—পদব্রজে? ভাবিতেই ভয় হয়, হয়তো তপস্যা শুরু করার আগেই নির্বাণ লাভ করিব।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া দেখিলাম, বাড়ীর পাশেই শিশির-বিন্দু রহিয়াছে। আমি মূর্খ বলিয়া এতক্ষণ মনে পড়ে নাই, ভগবৎ

কৃপায় দৃষ্টি খুলিয়া গেল।...ঢাকুরিয়া লেকের মধ্যে ছোট একটা দ্বীপের মত একটি কুঞ্জ। রোয়িং ক্লাবের ছেলেরা বলে, আয়ল্যাণ্ড। কিন্তু আমার কাছে সেটি কন্যাকুমারিকার স্বামী বিবেকানন্দ রকের মত প্রতীয়মান হইল। বিস্ময়ে কিছুক্ষণ অভিভূত হইয়া রহিলাম। সত্যি, এমন সাধনোচিত ধাম আর কোথায় আছে ?

সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি রোয়িং বোট ম্যানেজ করিয়া আস্তে আস্তে দ্বীপটির দিকে রওয়া হইলাম। ঘোর অমাবস্যা, তদুপরি ইলেক্ট্রিক কোম্পানীর দয়ায় ও সুবিবেচনায় লেকের ধারে বা আশেপাশেও কোনো আলোর উৎপাত ছিল না। মোটরের হেড-লাইটগুলিই শুধু যা মাঝে মাঝে নিয়ম ভঙ্গ করিতেছিল। কী একটা সরাৎ করিয়া চলিয়া গেল। সাপখোপের ঝামেলা হইতে পারে ভাবিয়া এক বোতল কার্বলিক এ্যাসিড সঙ্গে আনিয়া-ছিলাম। সন্তর্পণে তাহাই ছড়াইতে ছড়াইতে বিজলী বাতি জ্বালাইয়া একটি ইষ্টক-নির্মিত ঘরের সামনে আসিয়া বসিলাম। পাশে লেক ক্লাব হইতে আনা এয়ার-গানটিও রাখিয়াছিলাম। ভূত-প্রেতকে ভয় দেখাইতে ইহাই যথেষ্ট।

মশার দংশনে অস্থির হইয়া পড়িয়াছি, চারিদিকে লেকের জল. কাহারা যেন আমার কানে কানে বলিল, 'মূর্খ! এ লেকের জল কেবলমাত্র জল নহে—ইহাতে বহু নর-নারীর, প্রেমিক-প্রেমিকার দীর্ঘশ্বাস মিশিয়া আছে। অনেকে এখানে জীবনদান করিয়াছে। এ পবিত্র স্থানে দুরাত্মা তুই নিজের ইষ্ট চিন্তা করিয়া তপস্যা করিতে আসিয়াছিস ? ধিক্—ধিক্—'

কোনো দিকে কর্ণপাত না করিয়া একপাত্র কারণবারি গলায় ঢালিয়া দিয়া শিরদাঁড়া সোজা করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলাম। কতক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছিল জানি না, হঠাৎ দেখিলাম চারিদিক আলোকে আলোকময় হইয়া গিয়াছে। ভাবিলাম, বোধ হয় দেবরাজ দর্শন দিতে আসিয়াছেন।

সাধারণ নিয়ম অনুসারে দেব-দর্শনের পূর্বে অপ্সরীদিগের

ক্যাবারে নৃত্য দেখাইয়া তপস্যা ভঙ্গের চেষ্টা করা হইল না দেখিয়া প্রথমে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম, তবে পরে দ্বিতীয়বার চিন্তা করিয়া দেখিলাম, ঠিকই হইয়াছে, অন্যের উপাসনা করিলে দেবরাজ তাহাদের বিপথে চালিত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আমি তো তাঁহারই ভক্ত, সুতরাং আমার সাধনায় বিঘ্ন ঘটাইয়া নিজের আখের নষ্ট করিবার মত পাত্র তিনি নহেন।

দেবরাজ বলিলেন, বৎস, তোমার স্তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। নরজাতির মধ্যে তুমিই যা একটু অরিজিন্যালিটি দেখাইয়াছ —বর প্রার্থনা করো।

মাথায় কি দুষ্ট বুদ্ধি চাপিয়া গেল, বলিলাম, প্রভু, একমাত্র অমর বর ছাড়া আমার অন্য কোনো বরে রুচি নাই।

হাসিয়া দেবরাজ বলিলেন, তথাস্তু।

ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হে দেব! প্রমাণ? আমরা মানুষ, প্রমাণ ছাড়া কিছুই বিশ্বাস করি না।

মৃদু হাস্য করিয়া দেবরাজ বলিলেন, শীঘ্রই প্রমাণ পাইবে।

আনন্দে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলাম, দেবরাজ অদৃশ্য।

লেকের পারে লোকজনের কলরব শ্রুতিগোচর হইল। একটা বড় সার্চ লাইট আমার গায়ের উপর আসিয়া পড়িতেই, ভূত-প্রেতের কারসাজি মনে করিয়া এয়ার-গানটা বাগাইয়া ধরিলাম। সঙ্গে সঙ্গে লেকের ধার থেকে লোকজনের চিৎকার ভাসিয়া আসিল—

বন্দুক তুলেছে, বন্দুক তুলেছে।

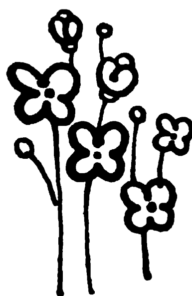
'ফায়ার'—দ্রুম করিয়া একটি শব্দ হইল।

... ...

তারপর কি হইয়াছে মনে নাই, হয়তো মরিয়া গিয়াছি। তবে দেবরাজ ইন্দ্রের বর আমি যাচাই করিয়া লইয়াছি। ভদ্রলোক আমাকে ঠকান নাই।

কর্পোরেশনে মাহিনার খাতা দেখিয়া আসিয়াছি, আমি

রেগুলার বেতন গ্রহণ করিতেছি। রবিবার ইডেনে ক্রিকেট খেলা দেখিতে গিয়াও দেখিয়াছি, আমার লাইফ মেম্বারশিপ এখনও কাটা যায় নাই, মেম্বারশিপ কার্ড ইস্যু হইয়াছে এবং রীতিমত খেলা দেখাও চলিতেছে। আর পরশু যে জেনারেল ইলেক্শন হইয়া গেল, দেখিলাম সেখানেও আমার ভোট ঠিক মতই পড়িয়াছে। রেশন শপেও রেশন ঠিক মতই ড্র করা হইতেছে, সুতরাং মরিয়া প্রমাণ করিয়াছি, আমি অমর হইয়াছি। জয় দেবরাজ, তুমি যুগ যুগ জিও।



জনতার বিচার



·—এই হারু, বাবু বাড়ী আছে ?

—আজ্ঞে, ঐ তো বসার ঘরে বসে আছেন।—বলিয়া বাজারের থলে হাতে করিয়া শঙ্করের কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ডটি বাহির হইয়া গেল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, একপাশে খবরের কাগজটা পড়িয়া আছে, টিপয়ের উপর রাখা চা ঠাণ্ডা হইতেছে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেটটি লইয়া শঙ্কর উদাসভাবে কি যেন ভাবিতেছে। আমার আগমনও টের পায় নাই।

ধাক্কা মারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি রে, সকালবেলা কার কথা ভাবছিস্ ?

—এঁ্যা!—না, কিছু ভাবছি না। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

—কেন, হঠাৎ আবার কি হলো ?

—কাল রাতে অনেক দেরী হয়েছে ফিরতে, ভাবছি আবার বিলেত ফিরে যাব।

যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। বলিলাম, সে কি, দেশ দেশ করে এত মাতামাতি ক'রে আবাব দেশ ছাড়বি কিরে ?

—কেন জানি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছি না, সত্য। আচ্ছা বোস্, হারুকে ডাকি, দু-কাপ চা দিয়ে যাক।

বাধা দিয়া বলি, হারু বাজারে চলে গেছে, কাজেই চা আর পাচ্ছিস না···

—বোস্, চা-এর জল চড়িয়ে দিয়ে আসি। বুঝলি, অনেক দিন বাইরে ছিলাম, কিছু কিছু কাজ নিজেও পারি। চাকর না থাকলেই চোখে সরষে ফুল দেখতে হয় না।

চা-এর জল চাপাইয়া শঙ্কর ফিরিয়া আসিতেই বলিলাম, আচ্ছা, বিলেতের কথা কি বলছিলি বল্।

—হ্যাঁ, বলছি, বুঝলি সত্য, আমি ও-দেশে তো মানুষকে গাড়ী চাপা পড়তে দেখেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে দেখেছি ডিসিপ্লিন। পথচারী যে লোকটি প্রথম ঘটনাটা দেখে, সে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে দেয়

পুলিশকে। দু'চার মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে পড়ে। আহত লোকটিকে তুলে দেয় এ্যাম্বুলেন্সে—তার ব্লাডপ্রেসার থেকে শুরু করে ইয়ার, নোজ, থ্রোট, চোখ, সব কিছু পরীক্ষা করা হয়। দেখা হয় পথচারীর কোন দোষ ছিল কিঁ না—আবার ওদিকে চালকের পরীক্ষাও চলে সব রকমের। গাড়ীর পরীক্ষাও বাদ যায় না। পথচারীদের ঐ টেলিফোনটি করা ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব থাকে না, আর এখানে ?···

—তোর হঠাৎ মোটর এ্যাক্সিডেন্টের কথা মনে হলো কেন ? অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করি।

—হ্যাঁ, সেই কথাই বলছিলাম। কাল ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে একটা ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে ঘুড়ি ধরতে যেতেই—"গেল গেল" চিৎকার। তারপর একটা ব্রেক টানার শব্দ। চেয়ে দেখি একটা ট্যাক্সি ছেলেটিকে চাপা দিয়েছে। ছেলেটা ছিট্‌কে পড়েছে পাশের ফুটপাতে। পথের কিছু লোকজন যখন ড্রাইভারকে মার লাগাতে ব্যস্ত—অতি উৎসাহী অপর কিছু লোক তখন গাড়িটায় দেয় আগুন ধরিয়ে। ভিড় ঠেলে আমি যখন গাড়িটার কাছে পৌঁচেছি, তখন গাড়িটাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ড্রাইভারকে খুঁজে পেলাম না, হয়তো গাড়ির ভাগ্যের সঙ্গে তার ভাগ্যও মিলে গেছে। কিন্তু ছেলেটা দেখলাম পড়ে আছে। কিছু লোক বলাবলি করছে, "ডাক্তার ডাকুন না !" ছেলেটি তখনও বেঁচে আছে—কিন্তু কেউ ডাক্তার ডাকছে না।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া শঙ্কর আবার বলে, জনতার বিচার শেষ হলো, কিন্তু ফুটফুটে ছেলেটা ?···

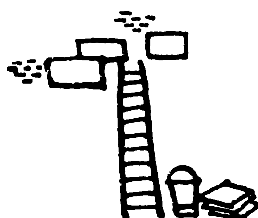
ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলাম। পর পর কয়েকটা ট্যাক্সিকে ডাকলাম কিন্তু দাঁড়াল না। সবাই ভয় পাচ্ছে, আবার কোন্ ফ্যাসাদে পড়বে। দু-একজনের সাহায্য চেয়েও দেখলাম, কাজের অছিলা করে তারাও কেটে পড়ল, অবশ্য দূর থেকে উপদেশ দিতে কার্পণ্য করেননি কেউ, আর করেছে ট্যাক্সি চালকের

বাপান্ত···সে নাই-বা শুনলি।

ছেলেটিকে নিয়ে তারপর একটা রিক্‌শায় করে মেডিকেল কলেজে যখন পৌঁছলাম, তখন সে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ডাক্তারটি দেখেশুনে বললেন, আর একটু আগেও যদি নিয়ে আসতে পারতেন—হয়তো বেঁচে যেত !

তারপর রাত দুটো পর্যন্ত পুলিশ আর থানা—থানা আর পুলিশ। ছেলেটির আত্মীয়-স্বজনকে খবর পাঠানো। তারপর আবার আমিই যে ছেলেটিকে খুন করিনি তারই বা প্রমাণ কি ? এতলোক থাকতে আমি কেন এ দায় নিতে গিয়েছিলাম ? আমার কি স্বার্থ ?—এ সব জবাবদিহি করে বাড়ী ফিরেছি প্রায় রাত তিনটেয়। আরও হয়তো কিছু ভোগান্তি আছে। সে না হয় পরে ভাবা যাবে—কিন্তু আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না সেই ফুটফুটে ছেলেটিকে। ছেলেটির চোখে আমি একটা ভাষাই পড়েছিলাম—"আমায় তোমরা বাঁচতে দিলে না"।



বানপ্রস্থ



পঞ্চাশে বানপ্রস্থের রীতি যে মহাপুরুষ দিয়াছিলেন তাঁহাকে বারবার প্রণাম জানাইয়াও যেন সাধ মিটিতেছে না। ভদ্রলোক বুঝিয়াছিলেন, সংসার অতি নিকৃষ্ট স্থান। যাঁহাদের বাসে করিয়া অফিসে যাইয়া রিসেপসনে চাকুরী করিতে হয় তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিবেন আমার ব্যথা কোথায়, অবশ্য সরকারী কর্মচারীদের হিসাবের মধ্যে ধরিতেছি না—তাঁহারা ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র—কাজ না করিলেও চলে, কিন্তু পাইভেট সেক্টরে—সওদাগরী অফিসে? বহু পাপ না করিলে···থাক সে কথা······

নয়টা নাগাদ হন্তদন্ত হইয়া অফিসে বাহির হইতেছি, গিন্নীর মধুর বাণী—অফিসে আজও আবার আড্ডা দিতে বোস না যেন; বড়দা বলেছেন তার সন্ধানে একটি সুপাত্র আছে, মেয়েটাকে এই মাসে যদি পার করতে পার? ছেলেগুলি তো উচ্ছন্নে গেল, বাপেরও তো আর দেখার সময় হয় না, মেয়েটা যাতে সময় মত ঘাড় থেকে নাবে তার দিকে একটু দৃষ্টি দিও।—তারপর অপূর্ব একটি মুখভঙ্গী করিয়া ফিনিশিং টাচ দিলেন—কি বাউণ্ডুলের হাতেই না পড়েছিলাম!···

আর দাঁড়াই নাই, 'হবে হবে' বলিয়া 'দুর্গা দুর্গা' করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি। বাসের ভিড়ের কথা নূতন করিয়া বলার কিছুই নাই। অতি কষ্টে যখন চিড়ে-চ্যাপ্টা হইয়া ঘামিতেছি, তখন হঠাৎ একদল ছেলে আসিয়া বাস থামাইয়া দিল, সবাই নেমে আসুন—বাস পোড়াব।

দেওয়ালী তো অনেকদিন শেষ হইয়া গিয়াছে। দিনের বেলা আবার?···না, ছেলেছোকরাদের কাজে বাধা দিতে নাই। এরাই জাতির ভবিষ্যৎ···

পড়ি কি মরি করিয়া সবাই একসঙ্গে নামার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। আমি নামিয়া আসিলাম, না আমাকে নামাইয়া দিল ঠিক বুঝিলাম না। দেখিলাম, পাঞ্জাবির বাঁ-পাশের কতকটা অংশ আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়া নামিতে পারে নাই। হয়তো

ফাঁকা জায়গা পাইয়া সিটের গায়ে হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতেছে। বেচারার বিশ্রামভঙ্গের চেষ্টা না করিয়া পদব্রজে অফিসের দিকে রওনা হইলাম।

গিন্নীর ভাইয়ের বাড়ী যাইতে হইবে বলিয়া ভাল দেখিয়া একটা পাঞ্জাবি দিয়াছিল, কপালে তাহা সহিল না। কোন রকমে বড়বাবুর পাশ কাটাইয়া কাউন্টারে যাইয়া বসিয়াছি, একটা উট্‌কো খদ্দের আসিয়া বলিল—শুনছেন, আপনাদের নূতন ক্যাটালগটা দিন তো? আজকাল ডিস্‌কাউন্ট কত পারসেণ্ট দিচ্ছেন? কোয়ালিটি তো দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে—দাম বাড়ছে কেন?—দু'হাতে লুটছেন—এঁ্যা?……

—এতগুলির জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়…ম্যানেজারবাবুকে জিজ্ঞেস করুন, ডাইরেক্টরকে বলুন, আমরা ছা-পোষা মানুষ।

—এঁ্যা?—আবার চোখ রাঙ্গাচ্ছেন, ম্যানেজার দেখাচ্ছেন? আচ্ছা…চিঠি লিখেই জানাব—রাগিয়া খদ্দেরটি গট্‌গট্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

দেখুন দেখি, কোথায় দুই-চার বছর এক্সটেন্‌শন লইবার চেষ্টায় আছি, এর চেয়ে ঘা কতক দিয়া গেলেও সহ্য করা কঠিন হইত না।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া টেবিল হইতে জলের গ্লাসটা লইয়া চোঁ চোঁ করিয়া পুরো গ্লাসটাই শেষ করিয়া দিলাম। কিছুটা ঠাণ্ডা হইয়া পাশে প্রণবেশবাবুকে আমার বিপদের কথা বলিলাম।

শুনিয়া প্রণবেশবাবু বলিলেন—আরে, এজন্যে ঘাবড়াচ্ছেন কেন? বিপদেই বন্ধুর পরীক্ষা। আপনি আমার চাদরখানা নিয়ে যান, এই দিয়েই পাঞ্জাবির বাঁ-দিকটা ম্যানেজ করে নেবেন।

সত্যিই—বিপদে না পড়িলে বন্ধু চেনা যায় না। একটু পরেই বুঝিলাম, চাদরখানা আমার দিকে আগাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, তিনকড়িবাবু, কিছু মনে করবেন না, গোটা পঁচিশেক টাকা হবে? এ মাসের মাহিনা পেলেই আপনার আগের টাকাটা সমেত দেড়শো

একবারেই দিয়ে দেবো।

না করিবার উপায় নাই, বিপদেই বন্ধুর পরীক্ষা। মাসের শেষ সম্বল, গোটা তিরিশেক টাকা ছিল—বুঝিলাম, এও গেল—

... ...

পাঁচটা বাজিতে মিনিট পাঁচেক বাকি, ভাবিয়াছিলাম বড়বাবুকে বলিয়া একটু আগেই বাহির হইয়া পড়িব, এমন সময় সাক্ষাৎ শমন। ইউনিয়নের সেক্রেটারীর নির্দেশ—প্রসেসনে যাইতে হইবে।

বুঝুন—বিপদ কিভাবে আসে! প্রসেসনে যোগ না দিলে আড়ং ধোলাইয়ের ব্যবস্থা—যোগ দিলে···রাত দশটায় গৃহে প্রবেশ—? গিন্নীর অভ্যর্থনা···না, আর ভাবিতে পারি না। মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল, পাশে তাকাইয়া দেখি, ইউনিয়নের সেক্রেটারী। তিনি ঠোঁট বাঁকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি তিনকড়িবাবু, আজও আবার একটা এক্সকিউজ দেবেন নাকি ?

—হেঁ হেঁ—কি যে বলেন—

সামনের দিকে দেখিলাম, বড়বাবুর অগ্নিদৃষ্টি, পিছন ফিরিয়া হাঁক দিলাম, কেষ্টা, এক গ্লাস জল।

... ...

এখনও নগদ পাঁচ টাকা পকেটে আছে, বানপ্রস্থের টিকিট কাটার পক্ষে যথেষ্ট কিনা ভাবিতেছি।



বুনিয়াদ



—এই তপেন, আজকের কাগজ দেখেছিস ? এম সি সি আসছে, পাঁচটা টেষ্ট আর দশটা ম্যাচ্ খেলবে।

তাসের প্যাকেটটা ভাঁজতে ভাঁজতে পরেশ বলে ওঠে—আরে এলেই বা কি, শ্লা, আমাদের সেই রেডিও শুনেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হবে।

—কেন রে, গতবার তো টিকিট পেয়েছিলি ?

—পেয়েছিলাম না, ম্যানেজ করেছিলাম, সেটা আবার ঝেড়ে দিলাম না দু'শো টাকায়—তা দিয়েই তো ক'দিন ফূর্তি করা গেছিল।

তিনে বিরক্ত হয়ে বলে—নে, তাস দে, থ্রি হ্যাণ্ড কাটথ্রোট খেলা যাক, কমলেশটা আজ আর আসবে না।

বলতে বলতেই কমলেশ এসে পড়ে।

—হুর্‌রে—এই তো কমলেশ এসে গেছে—নে, চার হাতে খেলা যাক, কার্ড ফর পার্টনার।—তপেন কার্ড সাপল্ করতে করতে বলে।

—আরে রাখ তোর তাস—আজ যা একখানা হয়েছে না, শালা একটু পেট পুরে হেসে নি।—বলেই কমলেশ হাঃ-হাঃ করে হাসতে থাকে।

—আগে চা আনতে বল্।—শালা—স্বদেশীদা না···হাঃ-হাঃ—

—এই কেষ্টা, দু-কাপ ডবল-হাফ চা জল্‌দি পাঠিয়ে দে।—তিনে জানালা দিয়ে পাশের চা-এর দোকানে অর্ডার দিয়ে দেয়।

কনুই-এর গুতো দিয়ে তপেন বলে—কি, সেই থেকে নিজে নিজেই হেসে যাচ্ছিস, কি হয়েছে বল্ না ?

—বলছি—বলছি, ঐ যে ভজহরিবাবু, পাড়ার কিছু একটা হলেই সভাপতি হবার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কথায় কথায় দেশাত্মবোধের লেক্‌চার ঝাড়ে, আজ একেবারে···

হাসি থামাতে থামাতে আবার কমলেশ বলতে থাকে, বুঝলি, আজ ম্যাটিনি শোয়ে লাইট হাউসে একটা বই দেখতে গিয়ে-

ছিলাম। আরে না, নিজের পয়সায় নয়, বড়দি আর জামাইবাবু এসেছে না, ওরাই নিয়ে গিয়েছিল।

—রেখে দে তোর দিদি আর জামাইবাবু, ভজহরিবাবুর কি হলো বল।

—আরে সে কথাই তো বলছি, বইটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, কিছু লোক জাতীয় সঙ্গীতের ভয়ে পালাচ্ছে, কয়েকটা লালমুখো বিদেশীও ছিল, পালিয়ে যাওয়া লোকগুলির দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিল। বুঝলি তপেন, আমারও মাথায় রক্ত উঠে গেল, হতচ্ছাড়ারা লাইন দিয়ে টিকিট কিনে তিন ঘণ্টা ধরে বই দেখতে সময় পেল, আর জাতীয় সঙ্গীতের সময়েই তাদের সময়ের দাম! মনে হচ্ছিল গাঁট্টা মেরে ওদের সিনেমা দেখার সাধ চিরতরে মিটিয়ে দিই, এমন সময় দেখি পেছন থেকে ভজহরিবাবুও তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যাচ্ছেন—আর যায় কোথায়? দেশপ্রেমের ভণ্ডামি, সেরেফ ডান পা-টা বাড়িয়ে দিলাম, আর হুমড়ি খেয়ে একেবারে পপাতঃ ধরণীতলে।···হাঃ—হাঃ—সে যে একখানা সিন্। তখনি জাতীয় সঙ্গীত শেষ হয়েছে, সবাই ভজহরিবাবুকে টিট্‌কিরি দিচ্ছে। কাছাকোঁচা ঠিক করে যখন বেরিয়ে এল, তখন আর আমাদের পাড়ার সভাপতি ভজহরি বটব্যালকে যেন চেনার উপায় নেই। নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, একেবারে হতভম্ব।

—সাবাস্ কমলেশ—তিনে, কমলেশকে দু-কাপ চা খাওয়া।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে পরেশ বলল—আরে, তাহলে আরেক-খানা সেম্পল শোন্। সেদিন গিয়েছিলাম ভজহরিবাবুর বাড়ী, সরস্বতী পুজোর চাঁদা আনতে। গিয়ে দেখি, ছেলেকে পড়াচ্ছেন, 'সদা সত্য কথা বলিবে'···আমাদের দেখেই বললেন, এসো এসো, ছেলেটাকে একটু নীতিশিক্ষা দিচ্ছি; বুঝলে বাবা, এ সময়কার শিক্ষাই হলো জীবনের আসল বুনিয়াদ, চরিত্রই যদি না থাকে, তবে জাতির আশা ভরসা আর কোথায়? এমন সময় ভজহরিবাবুর বড়

ছেলে হ্যাপ্‌লা এসে বলল, বাবা, টেলিফোন এসেছে।

বিরক্ত হয়ে ভজহরিবাবু খেঁকিয়ে উঠে বললেন—জ্বালাতন, জ্বালাতন, যা বলে দে, আমি বাড়ী নেই। ছোট ছেলে লেখা বন্ধ করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে, ভজহরিবাবু ধমকে ওঠেন, হতচ্ছাড়া ছেলে, তোকে না বললাম, দশবার 'সদা সত্য কথা বলিবে'—ও লাইনটা লিখতে। খালি ফাঁকি দেবার যম। যা, বাড়ীর ভিতরে যা, আমি পরে আবার ডাকব। এমন সময় গঙ্গাধর হাই স্কুলের পিওন এসে ভজহরিবাবুকে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানা পড়েই ভজহরিবাবুর মুখখানা হয়ে গেল বোলতার চাকের মত। ক্যাব্‌লা পাততাড়ি গুটিয়ে ভেতরে যাবার উপক্রম করতেই ভজহরিবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—এ্যাই, শোন, হ্যাপ্‌লাকে পাঠিয়ে দে। ছেলেটা কাল স্কুলে কার পেন্‌সিল চুরি করেছে। আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, বুঝেছ, ছেলেদের এ বয়সটা খুব শাসনে রাখতে হয়। একটু কশি আলগা করেছ কি, সব শেষ—

হ্যাপ্‌লা ঘরে ঢোকামাত্র তার কান ধরে সমানে চড় মারতে লাগলেন—হতচ্ছাড়া ছেলে, স্কুল থেকে পেন্‌সিল চুরি করেছ, হেডমাষ্টার মশাই চিঠি দিয়েছেন, একেবারে গোল্লায় গেছ তুমি।—কেন?—কেন? হতভাগা, আমায় বলতে কি হয়েছিল, আমি অফিস থেকে দশটা পেন্‌সিল এনে দিতাম—

—বুঝলি তপেন, আমরা আর বসতে পারিনি. জাতি গঠনের নমুনা দেখে পালিয়ে বেঁচেছিলাম।



॥ এক ॥

রাত্রি প্রায় বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। নিরিবিলি দেখিয়া গঙ্গার ধারে আসিয়া বসিয়াছি। সন্তর্পণে কোমরের গেঁজে হইতে মৌতাতের কৌটাটি বাহির করিয়া মটরভর আফিং গলায় চালান করিয়া দিলাম। সামনের বটগাছটিতে হেলান দিয়া ভগবৎ-চিন্তায় মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম।

এমন সময় পাশ হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—বৎস, গায়ে ঠেস দিয়া বসিও না, লিখিতে অসুবিধা হইতেছে।

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, গণদেবতা তাহার ক্রোড়দেশের উপর স্থাপিত একখানা বিশালকায় পুঁথিতে কি যেন লিখিয়া যাইতেছেন।

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—দেব, আপনি এখানে?

—কেন হে? দেবগণের মর্তে আগমন কি নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে?

জিভ কাটিয়া বলিলাম—আজ্ঞে না, তবে আপনারা তো বিনা প্রয়োজনে এ দিকটায় পদার্পণ করেন না—কি উদ্দেশ্যে আগমন যদি খোলসা করিয়া বলেন, তবে অধীন ধন্য হয়।

—না হে, অত সঙ্কুচিত হইতে হইবে না। দেবলোক হইতে বাংলাদেশের সমস্ত সংবাদ সরজমিনে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার এখানে আগমন। কিছু কিছু বিষয় টুকিয়া রাখিতেছি। তবে সত্য কথা বলিতে কি, অনেক কিছুই সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তোমরা তো জান, আমি না বুঝিয়া কিছুই লিখি না।

—প্রভু, আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার স্বল্পবুদ্ধিতে যতদূর সম্ভব আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়া যাইব।

আনন্দিত হইয়া দেব বলিলেন—তুমি সত্যই আমাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করিলে। তারপর পুঁথিটির কয়েকটি পাতা উল্টাইতে

উল্টাইতে একটি জায়গায় থামিয়া যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, এখানে আসিয়া অনেকবার ডেমোক্রেসী সম্বন্ধে আলোচনা শুনিলাম, বুঝিতে পারিলাম না। কথাটা বোধহয় পশ্চিম হইতে আমদানি করা হইয়াছে ?

—আজ্ঞে হাঁ, ডেমোক্রেসী কথাটার মানে হইতেছে গণতন্ত্র।

রুষ্ট হইয়া দেব বলিলেন—তা পশ্চিম হইতে আমদানি করিতে হইল কেন? এদেশে কি ইহার অভাব ছিল? কেন, সীতার বনবাসের কথা কি তোমাদের মনে নাই? পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথাও কি ভুলিয়া গিয়াছ ?

—ক্রোধ সংবরণ করুন প্রভু! আজকাল আমরা রামায়ণ-মহাভারত পড়ি না, বড়জোর ইলিয়াড-ওডেসী পড়ি, তাহাও পকেট এডিসন।

—কেন ?

আজকাল বিদেশী জিনিস না হইলে এদেশে কিছুই চলিবে না। এই দেখুন না, বিদেশীরা চলিয়া যাইবার পর এখানে বিদেশানুরাগ আমাদের মধ্যে কিরকমভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের চলনে-বলনে সর্বত্রই বিদেশীর প্রভাব। আজকাল বিশিষ্ট লোকদের সমাবেশ করাইতে হইলেই ককটেল পার্টির প্রয়োজন হয়···

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই দেব জিজ্ঞাসা করিলেন—ককটেল! সেটা আবার কি ?

—ওটা আপনি ঠিক বুঝিতে পারিবেন না, আপনার বাবা হইলে বুঝিতে পারিতেন।

চোখ পাকাইয়া দেব বলিলেন—প্রশ্নের জবাব দেবে, বাবা-দাদাকে ডাকা কেন ?

—নাক-কান মলিতেছি, আর হইবে না। এখানে অনেকে বলে কিনা "ভুলে যাব বাপের নাম—ভুলব নাকো ভিয়েৎনাম।"

—ভিয়েৎনামটা কি ?

—দেব, আমিও প্রশ্নটা মিছিলের একটি ছেলেকে একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

—কি উত্তর পাইয়াছিলে?

—আজ্ঞে, ছেলেটি জানাইয়াছিল—বাংলাদেশের কোনও একটি স্থান। বাপের নাম কেন ভুলিতে হইবে, আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তর দিয়াছিল—বাপের নাম মনে রাখিয়া আপনারা তো খালি ভুঁড়ি বাগাইয়াছেন, দেখি ভুলিয়া গিয়া আমরা কিছু করিতে পারি কিনা? ভুঁড়ির উল্লেখে একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম, তাই আর ঘাটাঘাটি করিতে সাহস হয় নাই।

—ঠিকই করিয়াছিলে, ভুঁড়ির ব্যাপারে একটু সাবধান হওয়াই ভাল। বলিয়াই নিজের ভুঁড়িব উপব হাত বুলাইতে বুলাইতে গণপতি বলিলেন—আচ্ছা, কয়েকজন লোক কিছুক্ষণ পূর্বে 'ডিগনিটি অফ্ লেবার' বলিয়া কি এক বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। ব্যাপারটা কি সম্বন্ধীয়—একটু বুঝাইয়া বলো।

—আজ্ঞে, ঐ পশ্চিমে কথাটার মানে হইল, শ্রমেব মর্যাদা। তবে হ্যাঁ, ঐ কথাটা এখন শুধুমাত্র রচনা লিখিবার সময় এবং বক্তৃতা দিবার সময়েই ব্যবহৃত হয়। নতুবা অন্য কোথাও ইহার কোন স্থান নাই; আমরা দৈহিক কাজ করিবার জন্য অন্যান্য প্রদেশ হইতে লোক আমদানি কবিয়া থাকি। অবশ্য এখানকার ছেলেরা শ্রমকাতর নহে। একটা একশত টাকা মাহিনার কেরানীগিবি চাকুরীব জন্য পাঁচ-ছয় হাজারেরও বেশী দরখাস্ত পড়িয়া থাকে।

—তোমবা দৈহিক পরিশ্রমকে ছোট করিয়া দেখ কেন? এই দেশের মত শ্রমেব মর্যাদা আর কোথায় দিয়াছে? জনকরাজা নিজে চাষ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণও রাজসূয় যজ্ঞে পদধৌত করিবার কার্যভার গ্রহণ কবিয়াও শ্রেষ্ঠ মানবের সম্মান পাইয়াছিলেন। এখন তোমরা পশ্চিম দেশেব অনুকরণ কর—তাহাদের সংগুণগুলির কোনটাই গ্রহণ করিতে পারিলে না।

—দেব, ভুল করিলেন। ভাল জিনিসের অনুকরণের প্রয়োজন

কি? যাহা ভাল, তাহা অবিনশ্বর। অপরপক্ষে, যাহা খারাপ তাহার স্থায়িত্ব কম। সুতরাং ভাল জিনিস যাচাই করিয়া লইবার প্রচুর সময় পাওয়া যাইবে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী খারাপ জিনিসগুলি সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ না করিলে পরে পস্তাইতে হইতে পারে।

—না, তোমাদের সঙ্গে কথা বলিয়া পার পাইবার উপায় নাই। একবার দ্বাপরে ব্যাসদেবের নিকট বাক্যের মারপ্যাঁচে পড়িয়া অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত লিখিতে হইয়াছিল। যাকগে, রামচন্দ্র যে বিভীষণকে অমর বর দিয়া গিয়াছিল—তাহার কোন খবর জান কি?

—আজ্ঞে, তিনি বহাল তবিয়তেই রহিয়াছেন। কখনও এক, কখনও বা বহুর মাঝখানে বিভিন্ন নাম ধরিয়া বিদ্যমান। কখনও তাঁহার নাম জয়চন্দ্র, কখনও মীরজাফর, কখনও বা······নাঃ, নামগুলি আর বলিব না। আপনি একটু ভোজনবিলাসী, কখন কাহাকে বলিয়া দিবেন কে জানে?

—ঠিক আছে, আমার প্রতি কটাক্ষ করিতে হইবে না। মর্তে আগমনের সংবাদ পাইয়া কাল ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, বিনয়, বাদল, দীনেশ দল বাঁধিয়া কৈলাসধামে আগমন করিয়াছিল। বাংলা-দেশের রাজনীতি কোন্ পথে চলিতেছে জানিবার জন্য তাহারা ব্যাকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। পাবো তো এ বিষয়ে কিছু জ্ঞান দান কর।

লজ্জিত হইয়া বলিলাম—কি যে বলেন, আপনাকে জ্ঞান-দান? তবে এখানকার বর্তমান রাজনীতিব কথা শুনিয়া উঁহাবা হয়তো খুশী হইবেন না।

—কেন, কারণ ব্যক্ত কর।

—আজ্ঞে, এখনকার রাজনীতির সঙ্গে দেশের ভালমন্দেব বিশেষ যোগ নাই। অনেকে ইহাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং, জীবিকার জন্য মত এবং পথ বদলাইতে তাহাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ হয় না। অবশ্য আমরা জনসাধারণ এই তীব্র বেকার-সমস্যার দিনে তাহাদের দিকে কটাক্ষপাত করি না, সারাজীবন

এই প্রফেশনের মধ্যে থাকিয়া শেষ বয়সে কোথায়ই বা যাইবে? নূতন করিয়া কাজ শেখার বয়স বা মানসিক অবস্থা—কোনটাই তাহাদের অনুকূল নহে। দেশ স্বাধীন হইয়াছে—তবে আমরা এখনও ভয়মুক্ত হইতে পারি নাই। রাজনৈতিক চেলা-চামুণ্ডাদের ভয়ে আমরা মন খুলিয়া কথা বলিতে পারি না। অবশ্য, আপনাদের সময়তেও মুখ খুলিয়া কথা বলিবার দরুন শিশুপালকে শ্রীকৃষ্ণের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছিল।

বিরক্ত হইয়া দেব বলিলেন—অর্বাচীনের মত কথা বলিও না। শিশুপালের নিরানব্বইটি অপরাধ মার্জনা করা হইয়াছিল। স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা দেওয়ার ফলেই এই অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে।

দেব রুষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া বলিলাম—দেব! এই জটিল প্রসঙ্গের আলোচনা এখানে না করাই বাঞ্ছনীয়, আপনি বরং অন্য প্রশ্ন করুন।

—আর অন্য প্রশ্ন করিবার মত সময় নাই। তুমি অনেক সময় নষ্ট করিয়াছ। আমারও কৈলাসে ফিরিবার সময় হইয়াছে। পারো তো আগামীকল্য এইস্থানেই অপেক্ষা করিও। আমার আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন আছে। তবে হ্যাঁ—আবার যেন নেশা করিয়া বুঁদ হইয়া বসিয়া থাকিও না।

পুঁথিপত্র লইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেই হাত জোড় করিয়া বলিলাম—দেব, আসিবার সময় কিছুটা বাবার প্রসাদ লইয়া আসিতে যেন ভুলিবেন না……

অযথা বাক্যব্যয় না করিয়া দেব অন্তর্হিত হইলেন।

॥ দুই ॥

ভোর হইয়া গিয়াছে। গত রাত্রির ঘটনাকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিব, না আজ আবার অপেক্ষা করিয়া দেখিব—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া

ভাবিতেছি······ভাবিতে ভাবিতে অনেক সময় চলিয়া গেল।

—গোড় লাগি সাধুবাবা, এক গ্লাস দুধ পিও।

চাহিয়া দেখিলাম, একজন গোয়ালা একটি বড় গ্লাসে করিয়া এক গ্লাস সফেন গো-দুগ্ধ আমার পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া যুক্তহস্তে বসিয়া রহিয়াছে। বুঝিলাম, আমাকে সাধু-মহান্ত বলিয়া ভুল করিয়াছে। ক্ষুধা পাইয়াছিল, গ্লাসটিকে খালি করিতে বিলম্ব হইল না। মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলাম, জীতে রহো বেটা—ভগবান তেরা ভালা করে। বেশী কথা বলিলে পাছে ধরা পড়িয়া যাই, ধ্যানের ভঙ্গিতে চোখ মুদ্রিত করিয়া বসিয়া রহিলাম। অনুভব করিলাম, ভক্ত গোয়ালাটি চলিয়া গিয়াছে। গৃহের কথা মনে হইল, কিন্তু ফিরিতে প্রবৃত্তি হইল না—আবার সেই একঘেয়ে জীবন, চারিদিকে কেবল একটানা "নাই নাই"। তারপর গত রাত্রে গৃহে না ফেরার স্বপক্ষে কোনও সুযুক্তি মাথায় আসিল না। বরঞ্চ, এখানে গণপতির জন্য অপেক্ষা করাই ভাল, স্বপ্নটা যাচাই করিয়া লওয়া যাইবে। এদিকে মন্দ ব্যাপার নহে, গঙ্গাস্নান করিয়া যাইবার সময়ে কেহ কেহ প্রণামী দিয়া যাইতে লাগিল। সত্যই, ভগবান যব দেতা ছপ্পর ফোঁড়কে দেতা। সন্ধ্যা নাগাদ দেখিলাম, খুচরা পয়সা মিলিয়া প্রায় টাকা চল্লিশেক হইয়াছে।

হৃষ্টমনে মুদ্রাগুলিকে কোমরে চালান করিয়া দিলাম। যাক্, গিন্নীর মুখঝাম্‌টা আর খাইতে হইবে না। "জয় শম্ভু" বলিয়া মটরভর আফিং গলায় ফেলিয়া দিলাম।

... ...

কে যেন ধাক্কা মারিতেছে। হাত দিয়া সরাইয়া আবার নাসিকাধ্বনি শুরু করিয়াছি। কে সম্মুখ হইতে বলিয়া উঠিল—নরাধম, আবার নেশা করিয়াছিস ?

চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি, গণদেবতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। পাশে তাঁহার পিতৃদেবের ষণ্ডটি আমার দিকে শৃঙ্গ বাঁকাইয়া রহিয়াছে। একটু সরিয়া বসিয়া বলিলাম—দেব, অপরাধ হইয়া

গিয়াছে, আসন গ্রহণ করুন। তারপর কৈলাসের খবর সব কুশল তো? বাবার প্রসাদের আশায় অনেকক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছি।

—প্রসাদ লইয়া আসি নাই, তবে পিতৃদেবের বাহনটিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। শৃঙ্গ দুইটি দেখিয়া রাখ, বেয়াদপি করিলে সমুচিত ফলভোগ করিবে।

যণ্ডটির দিকে সভয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম—যথেষ্ট হইয়াছে। দেব, এবার দয়া করিয়া আপনার প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করুন।

বিরাট পুথিটি খুলিয়া দেব বলিলেন—ঠিক আছে। এখানে শুনিলাম, তোমরা দরিদ্রনারায়ণ সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ কর?

—আজ্ঞে, যথার্থই শ্রবণ করিয়াছেন। দরিদ্রনারায়ণের ব্যবসা ভালই চলিতেছে। এখন ঐ ব্যবসা আর ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া নহে—পরন্তু তাঁহারা প্রায় 'আউট' হইয়া গিয়াছেন। এখন এই ব্যবসা সর্বস্তরে বিদ্যমান, এই ব্যবসায়ে কোন প্রকারের কর দিতে হয় না। ইহারা প্রচুর পরিমাণে রোগ এবং ক্রিমিন্যাল তৈয়ারি করিয়া থাকে। আমরাও পাপস্খলনের জন্য এবং নিজেদের সামাজিক কর্তব্যবিমুখতার কথা চিন্তা করিয়া কখনও কখনও নিজের তৃপ্তির জন্য ইহাদের কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া এই ব্যবসার পোষকতা করিয়া থাকি। মাঝে মাঝে এই ব্যবসার রাঘব-বোয়ালগণ পুত্র-কন্যা চুরি করিয়া সংগ্রহ করে এবং খোদার উপর খোদকারি করিয়া বিচিত্র রূপের দরিদ্রনারায়ণ সৃষ্টি করে। তবে হ্যাঁ, মিথ্যা বলিব না—ইহার একটা ভাল দিকও আছে। ইহারা দেশকে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করে। বিদেশী পর্যটকগণ বেশীর ভাগ এদের ছবি তুলিতেই এদেশে আগমন করেন।

—থাম, বেশী বখামি করিও না। ধমক দিয়া দেব বলিলেন, তোমরা এই বিরাট সমস্যা সমাধানের কোন পথ চিন্তা করিয়াছ কি?

—দেব, চিন্তা করিয়া কি হইবে? ইহাদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে ঘেরাও করিয়া রাখিয়া খাদ্য ও বস্ত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে এবং কিঞ্চিৎ মুদ্রার বিনিময়ে ইহাদের দিয়া যথাসম্ভব কাজকর্ম করাইয়া লইয়া নূতন করিয়া আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে, নচেৎ নয়।

—এ কার্যের দায়িত্ব কে গ্রহণ করিতে পারে?

—আজ্ঞে, সরকার অগ্রসর হইলেই এ কার্যের সুরাহা হয়। সরকারকে এজন্য নূতন কর চাপাইতে হইবে। আমার মনে হয়, জনসাধারণও ইহাতে আপত্তি করিবেন না।

—এতই যখন বুঝিয়াছ, তখন সমাধানের চেষ্টা হইতে বিরত রহিয়াছ কেন?

—দেব, ভুল করিলেন। আমরা নিজেদের বিষয় ছাড়া অন্য দিকে মাথা ঘামাই না। এ সব কার্যের জন্য 'নেতা' নামক এক ধরনের নূতন দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা 'ভোট' নামক পুষ্পে তাহাদের পূজা করিয়া থাকি। ইহা একান্তভাবে তাহাদের ব্যাপার। অন্যের কার্যক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশকে আমরা নিন্দনীয় মনে করি— আবার রাজনীতি আসিয়া পড়িল……

—তোমরা উচ্ছন্নে যাও। আচ্ছা, বাঙালীর সংস্কৃতি, বাঙালীর সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনিতে পাইতাম। সে সম্বন্ধে কিছু বলো।

—দেব, বাঙালীর রুচিবোধের প্রমাণ যে-কোন পূজামণ্ডপে উপস্থিত হইলেই জানিতে পারিবেন। সৌন্দর্যবোধ—শহরের দেয়ালগুলিতে সসম্মানে বিদ্যমান; রেলগাড়ীর বিশ্রামাগারে এবং স্কুল-কলেজের স্নানাগারে অপূর্ব সাহিত্যের নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। সব কথা আপনাকে বলা চলিবে না। আপনি দেবতা হইলেও ছেলেমানুষ—আপনার বাবা হয়তো রুষ্ট হইতে পারেন।

—বাচালতা করিও না, শুনিয়াছি বাঙালীর চিন্তাধারায় সমগ্র ভারত লাভবান হইয়াছে।

—দেব, যথার্থই শুনিয়াছেন। বাঙ্গালী সত্যিকারই ভারতবর্ষের দধীচি মুনির ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। যাহা কিছু নূতন—সে ধর্ম, শিক্ষা ও রাজনীতি যাহাই হউক না কেন—বাংলাদেশ তাহাকে গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া নিজে বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও ভারতকে রক্ষা করে।

—হুঁ, বুঝিলাম। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দেব বলিলেন—আচ্ছা, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি বলিতে পার?

—দেব, ভবিষ্যৎ? ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এখনই আমার হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিতেছে। তখন আর মৌতাত করিতে নিরিবিলি স্থান খুঁজিতে গঙ্গার ঘাটে আসিতে হইবে না—আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি—বিশাল বিশাল রাজপথ, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, বিভিন্ন ধরনের অগুন্তি ফ্যাক্টরী ও কল-কারখানা বিদ্যমান। একটু থামিয়া বলিলাম, তবে জনমানব নাই—সবাই পলায়ন করিয়াছে। ফারাক্কার জল ফক্কা হইয়া যাওয়ায়, কলিকাতা ও হলদিয়ার বন্দর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এখানকার জিনিসপত্র মাদ্রাজ, থুড়ি, তামিলনাড়ু অথবা বম্বের বন্দর হইতে চালান দিতে হয়। ঐ প্রদেশের লোকেরা সুযোগ বুঝিয়া বেশ করিয়া ট্যাক্স বাগাইয়া আমাদের নিকট হইতে বেশ দু-পয়সা কামাইয়া লইতেছে।……

বৃদ্ধেরা কাশীতে ধর্ম করিতে গেলে উইল করিয়া যাইতেছে—কারণ বিদেশী কোম্পানিগুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশী বিমানগুলিও কলিকাতা বন্দর পরিত্যাগ করিয়াছে। রেল চালাইয়া বৎসরের পর বৎসর মোটা টাকার লোকসান রেল কোম্পানি সহ্য করিতে না পারিয়া রেলগাড়ী তুলিয়া দিয়াছে। পদব্রজে ছাড়া বিদেশে যাইবার উপায় নাই। বাংলাদেশ বনজঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ আবার বৃক্ষে বৃক্ষে লম্ফ দিয়া বৃক্ষের শোভা বর্ধন করিতেছেন। দেব, সত্য সত্যই রামরাজ্য ফিরিয়া আসিয়াছে। বাঙালী, তুমি ভাগ্যবান।

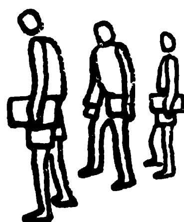
বিরক্ত হইয়া দেব বলিলেন—তোমার নেশা হইয়াছে, আর প্রশ্ন

করিয়া ফল হইবে না। একটু থামিয়া আবার নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন—ইন্দুরটা এখনও আসিয়া পৌঁছাইল না। বড়বাজারে বংশধরদের দেখিতে সেই যে কখন গিয়াছে, আর ফিরিবার নাম নাই।

আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আমি পিতৃদেবের ষণ্ডটির উপর আরোহণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছি। আমার বাহনটি ফিরিয়া আসিলে বলিয়া দিও, সে যেন আমার জন্য আর অপেক্ষা না করে।

—দেব, আমিও অত্যন্ত ক্লান্ত। মৌতাত প্রায় ছুটিয়া গিয়াছে, এ কাজের ভার আর কাহারও উপর অর্পণ করুন।

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, ষণ্ডটি ঘোঁৎ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার শৃঙ্গের ধাক্কায় হাত দশেক উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম। কোমরটা ভাঙ্গিয়াছে কিনা বুঝিলাম না, তবে মৌতাতের কৌটাটি ছিটকাইয়া গঙ্গায় পড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছে।



শ্যামপুকুরের ঘোষদের কারখানায় শুনেছিলাম দুটো সিফ্‌ট হবে?

শান্তনু হতাশ হইয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—দুটো সিফ্‌ট করলে অনেক ছেলের চাকরি হয়, তাই না?···কিন্তু আমাদের মেহনতী বন্ধুদের ওভারটাইম কমে যাবে না? তারা সিফ্‌ট করতে দেবে কেন?

শান্তনুর কথার জের টানিয়া অরুণ বলিল—বুঝলি দেবু, আমাদের কথা কেউ ভাবে না। এমনকি, মা-বাবা-ভাইবোন—তারা পর্যন্ত দিনের পর দিন দূরে সরে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ রে, কুলিগিরি করলে কেমন হয় রে? ইউনিভারসিটির ডিগ্রীগুলো না হয় সময়মত গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসব।

দেবু শান্তনুকে থামাইয়া দিয়া বলিল—রেখে দে তোর ডিগ্রী। আজকাল ডিগ্রী দেখে লোকে হাসে। বলে কি জানিস? বলে, কোন্ বছরে পাস করেছ? এখন তো সবাই পাস করে—ফেল করাই তো কঠিন। একজন তো সেদিন মুখের উপরই বলে দিল—বুঝলে হে, আজকাল ঠিক করেছি চল্লিশের নিচে কোন ডাক্তার ডাকব না।

অরুণ কি বলিতে যাইতেছিল, শান্তনু তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—আরে দেখ্ দেখ্, ঐ যে বাবুটি আসছেন—আমাদের কেষ্টা না?

—হ্যাঁ রে, তোদের সেই পুরানো চাকরটাই তো! আরে·বাবা, বেড়ে সেজেছে তো···

সামনের দিকে তাকাইয়া শান্তনু কেষ্টকে ডাকিয়া বলিল—কে রে, কেষ্টা না! সে কি রে! একেবারে ফুলবাবু সেজে এসেছিস। দিনকাল ভালই চলছে তাহলে—অ্যাঁ, কি বলিস্?

আধ হাত জিভ বাহির করিয়া কেষ্ট বলিল—কি যে বলেন দাদাবাবু, আমি আপনাদের কাছে চাকর ছাড়া আর কি?

শান্তনু জিজ্ঞাসা করিল—তা যাচ্ছিস কোথায়?

—এঁজ্ঞে, আপনাদের বাসাতেই যাচ্ছি দাদাবাবু। অনেকদিন

আপনাদের নুন খেয়েছি, দুর্দিনে আপনারা আমায় দেখেছেন, আজ পঞ্চাশ টাকা মাইনে বেড়েছে, তাই মাকে আর বাবুকে পেন্নাম করতে যাচ্ছি···

দেবু আঁতকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—পঞ্চাশ টাকা মাইনে বেড়েছে ? তা বাপু, এখন মোট কত পাচ্ছ ?

—এ জ্ঞে, পাঁচশ টাকা।

অবাক হইয়া শান্তনু জিজ্ঞাসা করিল, সে কি রে ? আলাদিনের প্রদীপ-ট্রদীপ পেয়েছিস নাকি ?

—না দাদাবাবু। বাবু চাকরি থেকে অবসর নেবার পর মা একদিন আমায় পঞ্চাশটা টাকা হাতে দিয়ে বললেন—কেষ্টা, দিন-কাল তো বুঝছিস, তোর দু' মাসের মাইনে দিয়ে দিলাম। তোর বাবুর তো চাকরি নেই, তুই আর কেন আমাদের সঙ্গে কষ্ট করবি ? কোথাও একটা কিছু কাজ জুটিয়ে নে। আমরা মুখ্যু মানুষ হলেও মা'র দুঃখ বুঝেছিলাম। দশ বছরের চাকরি···চোখের জল মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসেছিলাম। তারপর কিসে যে কি হয়ে গেল দাদাবাবু—মনে হচ্ছে স্বপ্ন। একটা রান্নার কাজ নিয়ে খিদিরপুরে একটা বড় কারখানায় ঢুকে পড়ি—তারপর কখন কিভাবে তাদের ইস্টাফ রোলে ঢুকে পড়লাম জানি না।·· দু'চার বছরের মধ্যেই মাইনে সাড়ে চারশো হয়ে গেল দাদাবাবু। তারপর পরশু দিন ইষ্ট্রাইকের পর আমাদের মাইনে আরও পঞ্চাশ টাকা করে বেড়েছে।

—আচ্ছা কেষ্ট, তুই কি মনে করিস, এ মাইনে তোর যথেষ্ট নয় ?

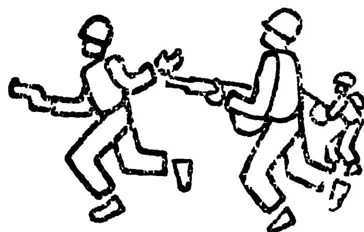
—কি যে বলেন—লজ্জিত হইয়া কেষ্ট বলিল। দাদাবাবু, আমি ইউনিয়নের সিক্রেটারীবাবুকে বলেছিনু—বাবু, আমরা যে টাকা মাইনে পাচ্ছি তা আমাদের যোগ্যতার অনেক বেশী, আমাদের মাইনে আর বাড়িয়ো না—অধম্ম হবে। দেখছ না সোনারচাঁদ ছেলেরা বড় বড় পাস করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই বাড়তি টাকায় ওনাগো নেবার বন্দোবস্ত কর। সেইভাবেই কত্তাগো সঙ্গে

কথা কও।

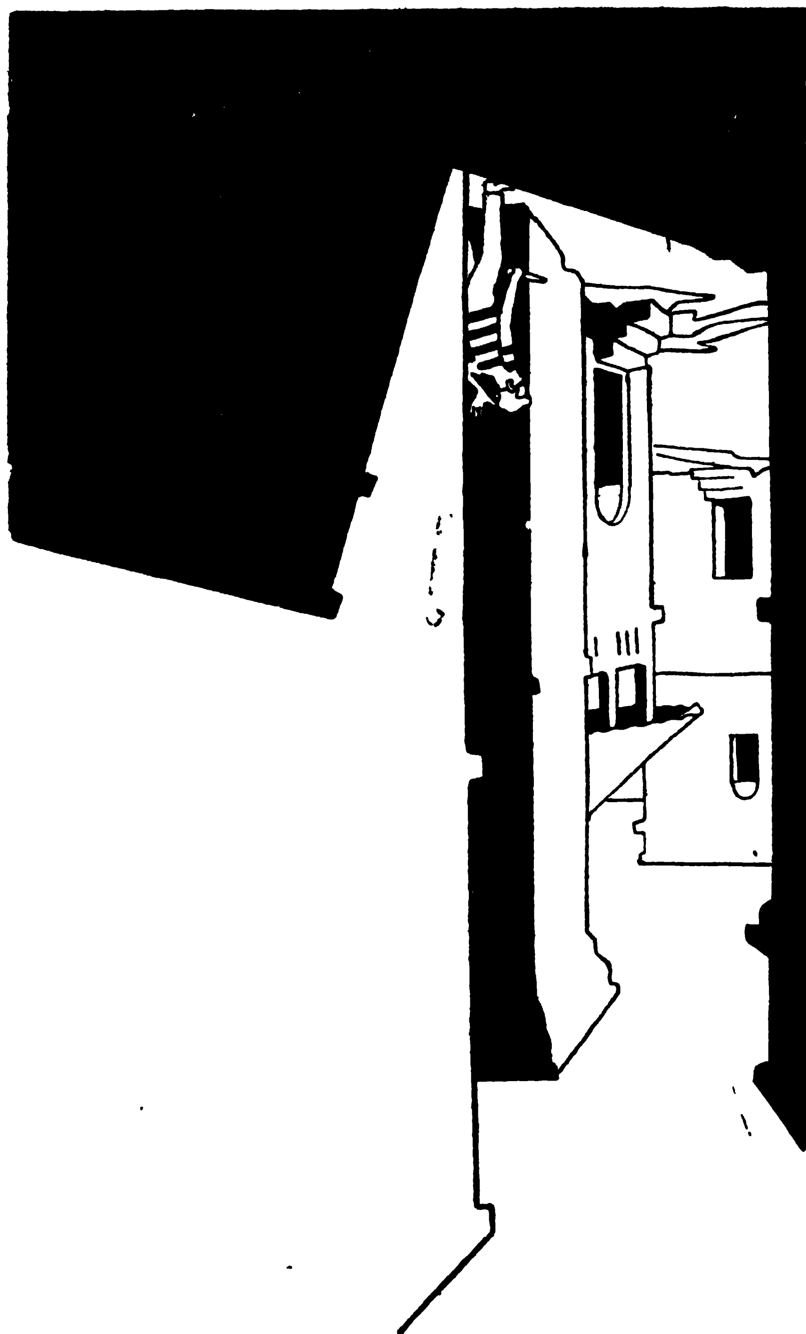
একটু থামিয়া ভারী গলায় আবার বলিতে শুরু করিল—কি বলব দাদাবাবু, ওনারা আমাকে বুদ্ধু বলল, আমাকে বোকা বলল···। চোখ মুছিয়া বলিল—এখন যাই দাদাবাবু, বাবু হয়তো শুয়ে পড়বেন—মাকে পেন্নাম করে আসি।

কেষ্ট ধীরে ধীরে শান্তনুদের বাড়ির দিকে চলিতে শুরু করিল।

চোখে বালি পড়িয়াছিল কিনা জানি না, তবে রুমাল দিয়া চোখটা মুছিয়া শান্তনু বলিল—দেখলি, ওরা তবু আমাদের কথা ভাবছে। বলিয়া উদাসভাবে কেষ্টার যাইবার পথের দিকে তাকাইয়া রহিল।



চোরা গলি



গিন্নীর মুখঝাম্‌টা আর সহ্য হয় না, মাষ্টারি করিয়া কিছু হইবে না, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা হইতে কিছু মোটা অংশ ধার লইয়া ব্যবসা ফাঁদিব মনস্থ করিয়াছি। আশেপাশে অনেক মূর্খ লোক আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়া গেল—আমি, একটা শিক্ষিত লোক হইয়া কিছুই করিতে পারিলাম না? অসম্ভব! গিন্নীকে দেখাইয়া দিব, এ শর্মাও কম নয়! কিন্তু এ লাইনে সত্যি কোন অভিজ্ঞতা নাই—পুঁটিমাছের প্রাণ। হঠাৎ গোবরার কথা মনে পড়িয়া গেল। আমারই প্রাক্তন ছাত্র, বারকয়েক একই ক্লাশে ফেল করিয়া শেষে একবার পরীক্ষায় নকল করিবার সময় হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া সেই যে স্কুল হইতে পালাইয়া গেল, আর স্কুলে প্রবেশ করে নাই। শুনিতে পাই, আজকাল সে বেশ দু' পয়সা কামাইতেছে। অনেক বৎসর তাহাকে উপদেশ দিয়াছি, দেখি আজ সে আমাকে কি উপদেশ দেয়!

... ...

অভিজাত পল্লীতে বেশ সাজানো গোছানো বাড়ি। কলিং বেল টিপিবার সঙ্গে সঙ্গেই দারোয়ান আসিয়া সেলাম ঠুকিতে গিয়া হাত তুলিয়াই নামাইয়া ফেলিল। বোধ হয়, আমার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহার পছন্দ হইল না।

বিরক্তিভরে সে জিজ্ঞাসা করিল—কিস্‌কো মাংতা?

—বাবু বাড়ি আছে? বলো গিয়ে মাস্টারবাবু এসেছেন।

অবজ্ঞাভরে একবার আপাদমস্তক দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া বাবুকে খবর দিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

গোবরা ঘরে প্রবেশ করিয়াই ব্যস্তভাবে কহিল—কি ব্যাপার! মাষ্টারমশাই যে, হঠাৎ আমার কাছে কি দরকার? বসুন, বসুন! এই কেষ্টা, দু' কাপ চা পাঠিয়ে দে।

—আবার চা কেন? তা বাবা, একটা পরামর্শের জন্য তোমার কাছে আসা।

—পরামর্শ কিসের?

—আজকালকার বাজার দেখছো তো, এই দু'শো টাকার স্কুলমাষ্টারিতে আর কুলিয়ে উঠতে পারছি না। আগে তবু দু-একটা টিউশনি জুটতো, এখন ক'বছর ধরে ইউনিভারসিটির ডামাডোলে তাও বন্ধ।

—তা তো বটেই, টিউশনিতেই তো আপনাদের লাভ, ইন্‌কাম-ট্যাক্স দিতে হয় না—কি বলেন? শুনি, স্কুলের মাইনেটি ছাড়া সবটাই হিসাবের বাইবে থাকে?

—তা বাবা, যা বলেছ। যে যুগের যে হাওয়া। তা একটা কম টাকায় ব্যবসা-ট্যাবসার কোন পথ বাত্‌লে দিতে পার?

গোবরা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—আপনি ব্যবসা করবেন কি মাষ্টারমশাই? নিন, চা খান।

কেষ্টা চা-এর কাপ নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

চা-এর কাপটি নিজের দিকে টানিয়া লইযা বলিলাম—না বাবা, সিরিয়াস্‌লি বলছি—একটা কিছু না করলে আর চলবে না।

গোবরা কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া থাকিয়া বলিল—কি ধরনের টাকা রোজগাব করতে চান, দেশী টাকা না ফরেন মানি?

চমকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—দেশী-ফরেন মানে?

—মানে আছে বৈকি, কম টাকায় দু' রকমের ব্যবসাই হয়, অবশ্য একবার নেমে পড়লে আর টাকার অভাব হয় না। তবে আদর্শ-টাদর্শগুলি একটু মানিয়ে নিতে হয়।

উৎসুকভাবে গোবরার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া গোবরা বলিল—ঠাকুর-দেবতার ব্যবসা করতে পারবেন? প্রথমে একটা বড় রাস্তার ধারে গাছতলা দেখে বসে পড়বেন। তারপর নুড়ি, সিঁদুর, শিষ্য, মন্দির—সব হয়ে যাবে। কাঁচা পয়সা, ইনকাম্‌ ট্যাক্‌স নেই···চালিয়ে যেতে পারেন ভাল।

চমকাইয়া বলিলাম—কি বলছ হে, ঐসব জায়গায় শুনেছি ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে হয়—তাছাড়া ঔষধপত্র দিতে হয়······?

—এখানে একটু বুদ্ধি খরচা করবেন। বলবেন, বর্তমান অবস্থা

খারাপ—কারণ, খারাপ না হলে কেউ আসে না। আর, ভবিষ্যৎ ভাল—এটা না বললেও কেউ পয়সা দেয় না। তারপর ওষুধ, এই ছাই-টাই বা জল-টল দিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যাবে।

ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিলাম—ধরা পড়লে পৈতৃক প্রাণটা টিকবে কি বাবা?

—অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? যাদের ফলে না, তারা গাঁটের পয়সা খরচ করে আপনাকে বলতে আসবে না। তা ছাড়া, বুজরুকের পাল্লায় পড়ে পয়সা নষ্ট করাটা নিশ্চয়ই পাণ্ডিত্যের পরিচয় নয়। তাই তারা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চেপে যায়। আর যাদের ফলে যায়, তারা প্রচণ্ড রকমের পাবলিসিটি দিয়ে থাকে······

শুরুতেই বুজরুক বিশেষণটিকে হজম করিয়া কহিলাম—তা বাবা যা বলছ, ওটা আমি বোধহয় পেরে উঠব না। তোমার ফরেন মানি সম্বন্ধে কিছু বলো, এটা লেগে গেলে হয়তো পৃথিবীটাও একবার ঘুরে দেখা যাবে। তারপর ফরেন মানি আয় করাটা—এটা দেশেরও কাজ।

—তা চেষ্টা করে দেখতে পারেন। এ লাইনে অনেক শিক্ষিত লোক আছে। এই ধরুন গিয়ে, বাংলাদেশ আর ভারতবর্ষের সম্পর্কের মধ্যে একটা ফাটল ধরানো।

চমকাইয়া উঠিয়া বলিলাম—সে কি হে, পঁচিশ বছর পরে রক্তের এই বন্ধন—ওতে ফাটল ধরাব কি হে?

—তা হলে আর ফরেন মানি পাবেন কি করে? ফরেনাররা তো আর শুধু শুধু আপনাকে টাকা দেবে না! এ ব্যাপারে টাকা দেশী-বিদেশী দু' রকমেরই পাবেন। শুধু ঝোপ বুঝে কোপ মারা।

হাঁ করিয়া গোবরার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকি।

আমার দিকে তাকাইয়া গোবরা বলিল—না মাষ্টারমশাই, ছাত্র পড়িয়ে পড়িয়ে আপনাদের মাথায় আর কিছুই ঢোকে না। শুনুন, দু' দেশেই কিছু সাম্প্রদায়িক মনোভাবের লোক আছে। তা ছাড়া, আছে চোরাকারবারী আর সুবিধাবাদীর দল—রাজনৈতিক দলও যে নেই, এমন নয়। আপনার কাজ হবে এদের কাজে

লাগানো। লোকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করুন, মাঝে মাঝে খবরের কাগজে কিছু সত্যি-মিথ্যা খবর ছাপাবার ব্যবস্থা করুন। আর যদি মিথ্যা বলতে বাধে তো সংবাদ সৃষ্টি করুন। এই যে বন্দে মাতরম্ আর আল্লা হো আকবর—আপনাদের কাছেই শুনেছি, কথা দুটোর মানে মোটেই খারাপ নয়। মাতাকে বন্দনা করাও যেমন দোষের নয়, তেমনি দোষের নয় ঈশ্বর মঙ্গলময় বলা। কিন্তু দু'দিক থেকে দু'দল লোককে যদি এই কথাটা জায়গা বিশেষে বলাতে পারেন, দেখবেন কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

—তার পর?

—তার পর যেসব রিফিউজি এখানে এসেছিল, তারা ফিরে গিয়ে অনেক কিছুই পায়নি। হিন্দু রিফিউজির সংখ্যা বেশী, সুতরাং তাদের ক্ষতিটাও আনুপাতিক হারে বেশী। প্রশাসনিক বিভাগ এখনও গ্রামাঞ্চলে গিয়ে পৌঁছায়নি। এদের বিভ্রান্ত করার এই সুবর্ণ সুযোগ। একবার গুজব যদি সৃষ্টি করতে পারেন—দেখবেন, ওটা নিজের জোরেই বাজার জাঁকিয়ে বসেছে। তারপর আছে মাছ, পাট আর সমাজদ্রোহী দালাল। লেগে যান, আখেরে পয়সা আছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমার দিকে তাকাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—কি-বলেন মাষ্টারমশাই, যোগাযোগ করব নাকি?

উপদেশ শুনিয়া তো চক্ষুস্থির। মনের ভাব গোপন করিয়া কহিলাম—সবুর কর বাবা, একটু ভেবে দেখি।

—তা যা ভাববার একটু তাড়াতাড়ি ভাববেন মাষ্টারমশাই। বলিয়াই গোবরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ আমার একটু কাজ আছে···।

—হ্যাঁ বাবা, আমিও যাচ্ছি, স্কুলের বেলা হয়ে গেল। বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম। বুঝিলাম, আমি অনেকবার ওকে ফেল করাইয়াছি, এবার বাগে পাইয়া আমাকে ও ফেল করাইয়া ছাড়িল।

আমরা সবাই রাজা



শিবনাথবাবু অ্যাকাউনটেণ্টবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, খাতা-পত্র পালটাইতে হইবে। নূতন ট্যাক্স বসিয়াছে, মেজাজ অত্যন্ত খারাপ। রাতদিন খাটিয়া - মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, সমস্ত সম্পত্তি রিস্ক করিয়া, এমনকি জীবনের পরোয়া পর্যন্ত না করিয়া যে ব্যবসা ফাঁদিয়াছেন, তাহা কি কেবল ' ট্যাক্স দিবার জন্য? এইভাবে যদি প্রতি বৎসর করের বোঝা বাড়িতেই থাকে, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে তাল রাখিয়া ফাঁকির মাত্রা বাড়াইলে দোষ কোথায়? একমাত্র পাল্কিওয়ালাই যা তাহাদের দুঃখ বুঝিয়াছেন, এখন অ্যাকাউনটেণ্ট, ক্যাশিয়ার—ইহারা বুঝিলেই কিছুটা সুরাহা।

এমন সময় এক ঝলক আলোর মত 'দাদু, দাদু' বলিয়া মঞ্জরী আসিয়া দাঁড়াইল।

আদুরে একমাত্র নাতনী, বি-এ পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়াছে, হাতে অফুরন্ত সময়। দাদুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—দাদু, তোমাকে পাঁচখানা চ্যারিটির টিকিট কিনতে হবে।

একটু থামিয়া আবার বলিল—দাদু, এই পাঁচখানা হলেই আমার 'কোটা' শেষ। বাব করো পঞ্চাশ টাকা।

আঁতকাইয়া উঠিয়া শিবনাথবাবু বলিলেন—আবে বাবা, পঞ্চাশ টাকা! দু'খানা দিয়ে যাও গিন্নী—।

কথাটা শেষ করিবাব আগেই মঞ্জরী ফোঁস করিয়া উঠিল—কেন? অনেক তো ব্ল্যাক মানি করেছ, এত টাকা দিয়ে করবে কি শুনি?

—আস্তে, আস্তে—আচ্ছা, মানিব্যাগে আছে নিয়ে যা···এই শোন্, বছরে তোদের ক্লাবে ক'টা ফাংশন হয় রে?

মানিব্যাগ হইতে টাকা বাহির করিতে করিতে মঞ্জু জবাব দেয়—ক'টা আবার? বছরে মাত্র তিনটে। ব্যাগটা যথাস্থানে রাখিয়া শিবনাথবাবুর পাশে বসিয়া পড়িয়া পা নাচাইতে নাচাইতে বলিল—জান দাদু, এবার আমি একা টিকিট বেচেছি প্রায় তিন শ'।

—তা তোর মত সুন্দরী মেয়ের পক্ষে এটা আর বেশী কি? আমার যদি বয়স থাকত গিন্নী, আমি একাই তোদের সব টিকিট কিনে নিতাম।

জিভ ভেংচাইয়া মঞ্জু বলিল—তোমার মত কিপ্‌টে কিনত সব টিকিট? জান, এবার আমরা আঠার শ' টিকিট বিক্রি করেছি।

চমকাইয়া উঠিয়া শিবনাথবাবু বলিলেন—সে কি রে! ফাংশন কি ময়দানে প্যাণ্ডেল বেঁধে করছিস না কি? না না বাপু, তোমার ওখানে যেয়ে কাজ নেই। সেবারকার রবীন্দ্র সরোবরের কথা মনে করলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

—দাত্নর যত বাজে কথা! প্যাণ্ডেল বেঁধে করব কেন? আমরা তো ববীন্দ্র সদনে করছি।

—কিন্তু সেখানে তো শুনেছি, এগারশো'র মত অ্যাকমোডেশন্?

—তাতে কি হয়েছে? যাদের কাছে টিকিট বিক্রি করেছি সবাই কি যাবে ভেবেছ? এই যে তুমি, প্রত্যেকবার টিকিট কেন—কোন্‌বার যাও? আচ্ছা, এ বুদ্ধি নিয়ে তোমরা ব্যবসা করো কি করে দাত্ন?

—সত্যি, তোব যে এতখানি বুদ্ধি হয়েছে আমার জানা ছিল না। হ্যাঁ, ভাল কথা—তোর রাঙ্গাদাত্ন আজ শ্রীরামপুর থেকে আসছে, তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল।

—এই রে, সেরেছে! আবার সেই সারমন্ শুরু করবে: এটা করো না, ওটা কবো না—সত্যি কথা বলবে—মিথ্যের আশ্রয় নেবে না…না—না দাত্ন, তোমরা যা হয়েছ না, এ যুগে সত্যি অচল…

—তা যা বলেছিস। সকাল থেকেই মুডটা খুব খারাপ ছিল, তুই আসতেই যা মেজাজটা একটু সরিফ্‌ হয়েছে। তোর ফাংশানে তো আর যাওয়া হবে না, সেদিন আমার একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। তুই বরং এখানেই আমাকে ত্ন'একটা গান শুনিয়ে দে।

—আ মরণ! তুমি গানের কি বোঝ? বেনাবনে আমি মুক্তো ছড়াই না।

—ধীরে গিন্নী, ধীরে। তোর দাতুরও একদিন বয়স ছিল, গান-বাজনা চর্চাও যে না করেছে, তা নয়।

খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে মঞ্জু বলে—দাতু, তোমার মত কাটখোট্টা মানুষ গান করত···এ আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না।

—হ্যাঁ রে সত্যি, তবে শোন। তখন আমার বয়স বারো কি তেরো। সবে নতুন বিয়ে করে তোর ঠাক্‌মাকে নিয়ে এসেছি, ওনার বয়স তখন সাত কি আট। তোর ঠাক্‌মাকে আচারের লোভ দেখিয়ে খিড়কির ঘাটে নিয়ে গিয়ে গান শোনাচ্ছিলাম: 'মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি, সখি জাগ সখি জাগ।' বাবা আর হেড পণ্ডিতমশাই যে ওদিক থেকেই আসছিলেন, দেখতে পাইনি। কানে টান পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম ব্যাপারখানা। ছু'টি বিরাশী সিক্কার চড় খেয়ে চোখে সরষে ফুল দেখতে দেখতে তোর ঠাক্‌মাকে সেখানে ফেলেই কোন্ দিকে যে পালিয়েছিলাম মনে নেই। তারপর অনেক লোভ দেখিয়েও তোর ঠাক্‌মাকে আর গান শোনাতে রাজী করাতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত মনের ছুঃখে গানই ছেড়ে দিলাম। তা না হলে, গিন্নী, কোথায় থাকত তোমার ওই হেমন্ত আর কোথায় থাকত তোমার সতীনাথ—?

মঞ্জুর হাসি আর থামিতে চাহে না। হাসিতে হাসিতে বলিল—ভাগ্যিস ছেড়ে দিয়েছিলে দাতু, তবু বেচারীরা কোন রকমে করে খাচ্ছে। আচ্ছা দাতু, তুমি একটা পুঁচকে মেয়েকে বাগে আনতে পারনি—অ্যাঁ! এ নিয়ে আবার সাহসের বড়াই করো?

—তোর ঠাক্‌মা? ওরে বাবা, উনি তখনও মহিষমর্দিনী।

—এটা কিন্তু ঠিক বলেছ দাতু, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কথাটা সত্যি।

কপট রাগ দেখাইয়া শিবনাথবাবু বলিলেন—গিন্নী, ভাল

হচ্ছে না কিন্তু।

—ছি, ছি, রাগ করো না দাছু, আমি আবার কি বললাম? তুমিই তো কনফেস্ করলে।

বাড়ির দরজায় গাড়ি থামিবার আওয়াজ পাইয়া মঞ্জু নিচে যাইতে যাইতে বলিল—দেখি আবার কে এল!

মঞ্জু লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া বলিল—দাছু, রাঙ্গাদাছু এসে গেছে।

—তাই নাকি? আসুন—আসুন বেয়াইমশাই, বলিয়া শিবনাথবাবু সদানন্দবাবুকে আনিয়া বসার ঘরে বসাইলেন।

—তারপর, বেয়াইমশাই, তবু ভাল যে মনে পড়ল। নাতনীকে দেখাইয়া বলিলেন—আ রে এই গিন্নী তো আপনার কথা মনে করে আমাকে পাত্তাই দেয় না। কি বলে জানেন বেয়াইমশাই? বলে—কালোবাজারী ব্যবসায়ীর চেয়ে অধ্যাপক রাঙ্গাদাছু অনেক ভাল।

ছুই বেয়াই হো-হো করিয়া হাসিতে থাকেন।

মঞ্জু চোখ পাকাইয়া বলিল—তোমরা ছুই বুড়ো রোমিও বসে বসে ঝগড়া করো, আমি ববং তোমাদের চা-জলখাবারের বন্দোবস্ত করি—বলিয়া মঞ্জরী রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

মঞ্জরীকে লক্ষ্য করিয়া সদানন্দবাবু বলিলেন—ছু'জনকে নিয়েই সামলাতে পারছ না গিন্নী, দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর কথাটা একবার মনে করো দেখি!

মঞ্জরী রান্নাঘর থেকেই জবাব দিল—সেদিকে আমরা পেছিয়ে নেই রাঙ্গাদাছু, দরকার হলে পঞ্চাশ জনকেও ঘোল খাওয়াতে পারি।

—তা ওরা পারে, শিবনাথবাবু সহাস্যে বলিলেন।—তারপর কি মনে করে বেয়াইমশাই?

—আর বলেন কেন? রমেনের মেয়ের বিয়ে, কিছু কেনাকাটা আছে—আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে।

—কই, রমেনকে তো দেখলাম না।

—না, ও গেছে প্রেস থেকে বিয়ের চিঠিগুলি ডেলিভারি নিতে, এই এল বলে।

... ...

রমেনের আসিতে বিলম্ব হইল না। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পাট সারা হইতেই বেলা প্রায় পড়িয়া আসিল। সদানন্দবাবুর পাল্লায় পড়িয়া শিবনাথবাবুকেও বিয়ের বাজারের সঙ্গী হইতে হইল। মঞ্জরীও বাদ পড়িল না।

অনেক দোকান ঘুরিয়া কেনাকাটা প্রায় শেষ।

রমেনবাবু সেল-ট্যাক্সের টাকাটা বাঁচাইয়াছেন, কোনো দোকান হইতেই ক্যাশমেমো চাহেন নাই। ক্রেতা-বিক্রেতা দুই পক্ষেরই লাভ হইয়াছে। একমাত্র সদানন্দবাবু মাঝে মাঝে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিতেছেন। তাঁহার মতে ইহা অতীব অন্যায়। ইহাও এক ধরনের চুরি। অনেকে করে বলিয়াই ইহা চৌর্যবৃত্তি নয়—এ যুক্তি তিনি কোনমতেই মানিতে পারিতেছেন না। প্রসঙ্গ পালটাইবার জন্য শিবনাথবাবু রমেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মেয়ের বিয়ে তো দিচ্ছ, তা ছেলেটি কি করে?

—তা মন্দ নয়, মাইনে প্রায় আটশ' টাকার মত পাচ্ছে। তার পর উপরি আছে।

—ভাল, ভাল।

সদানন্দবাবু খেঁকাইয়া উঠিলেন—ভাল বলছেন কি? উপরি মানেই তো চুরির পয়সা। রমেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আচ্ছা রমেন, তোমাদের লজ্জা হয় না?

মঞ্জরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল—রাঙ্গাদাদু, তুমি কি কেবল ঝগড়াই করবে? চলো, পাশের দোকান থেকে চা খেয়ে নি।

চা-এর তৃষ্ণা প্রায় সকলেরই পাইয়াছিল। কালক্ষেপ না করিয়া সকলে মিলিয়া চা-এর দোকানে ঢুকিয়া পড়িল।

পাশের টেবিলে একদল ছেলে জাঁকাইয়া বসিয়া আসর জমাইয়াছিল। একটি ছেলে বলিতেছিল—জানিস রাজেন, আজ

সারাদিন বাসে-ট্রামে একটা পয়সাও দিইনি—

রাজেন বলিল—আমিও এ সপ্তাহটা প্রায় ম্যানেজ করে এনেছিলাম, কিন্তু কাল শ্লা কন্‌ডাক্টর একেবারে লেডিজ সিটের সামনে এসে পয়সা চেয়ে বসল। কি আর করি, দিতে হলো। তবে হ্যাঁ, অচল আধুলিটা চালিয়ে দিয়েছিলাম।

—এই সত্য, আজ তোর পালা, বিলটা পেমেণ্ট করে দে—সতের টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পাশের কেবিনে দুইজন ভদ্রলোক আসিয়া বসিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে হইল আইনজীবী। একজন উত্তেজিতভাবে বলিতেছিলেন—প্রভাতবাবুর আক্কেলটা একবার দেখলেন? কোর্ট-কাছারীতে সব দেবতাকেই প্রণামী দিতে হয়, এ তো জানা কথা। টাকা দেবেন গুনে গুনে, তারও আবার হিসেব দাও। সিনিয়রকে বলতেই তো ফায়ার। আমিও ঘুঘু—আবার ডেট নিয়েছি।

—তা যা বলেছ, ওকালতিতে আজকাল আর সুখ নেই, লোক-জন যেন কোর্ট-কাছারীর দিকে এগুতেই চায় না। আরে, ভাড়াটে উচ্ছেদের মামলা করবে তা নয়, বাড়িওয়ালা ভাড়াটেকে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করছে, তবু আমাদের কাছে আসছে না। বলে কি জান? বলে—বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা—

সদানন্দবাবু নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—নরক।

বয় আসিয়া চা দিয়াছিল, সবাই চা পান করিতে থাকিলেও সদানন্দবাবু ছেলেদের কথাবার্তার দিকেই নজর রাখিতেছিলেন।

রাজেন নামের ছেলেটি পাশের ছেলেটিকে বলিতেছিল—তোদের কারখানায় বেড়ে আছিস। একবার অ্যাটেনডেন্স কার্ড পাঞ্চ করিয়ে এলেই হলো, ব্যাস···

—তোদেরই বা কম কিসে? আমাদের কারখানায় তবুও দু-চার জন কাজ করে, আর তোদের অফিস? ওয়ার্ক টু রুল—মানে, নো ওয়ার্ক, 'সিনেমা-জগৎ' আর 'উল্টোরথ' পড়ে বেশ আছ বাবা।

সদানন্দবাবু ছেলেগুলির দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন—'ওয়ার্ক থিফ।' তারপর মঞ্জুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—তোমাদের চা খাওয়া হলো ? আজকালকার হাল যে কি হয়েছে ! নরক, নরক। তারপর রমেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তুমি তো আজ আর বাড়ি ফিরছ না ?

—না, আমি একটু ভবানীপুর হয়ে কাল ফিরব।

—বেশ, তা হলে বেয়াইমশাই, আমি এবার এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। রাতে আবার ছেলেদের পরীক্ষার খাতাগুলি দেখতে হবে।

—সে কি বেয়াইমশাই ! আপনি কি জলে পড়েছেন নাকি ? আমরা আপনাকে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি বিল মিটাইয়া দিয়া শিবনাথবাবু সদলবলে বাহির হইয়া আসিলেন।

গাড়ির কাছেই পার্কিং ট্যাক্স আদায় করিবার জন্য একটি ছেলে দাঁড়াইয়াছিল। ছেলেটি একখানি কুপন আগাইয়া দিয়া বলিল—ষাট পয়সা।

খেঁকাইয়া উঠিয়া সদানন্দবাবু কহিলেন—আধঘণ্টা মাত্র দাঁড় করিয়েছি, ষাট পয়সা ? চোর যত সব···।

—যেতে দিন বেয়াইমশাই। এই নাও হে—বলিয়া পয়সা দিয়া শিবনাথবাবু ছেলেটিকে বিদায় করিয়া দিলেন।

গাড়িতে বসিয়া হাওড়া যাইবার সমস্ত পথটা সদানন্দবাবু গজগজ করিতে লাগিলেন—দেশটা একেবারে উচ্ছন্নে গেছে, সর্বত্র চুরি, ভেজাল আর মিথ্যার বেসাতি। ঘুষে ঘুষে দেশটা ছেয়ে গেছে। যিনি ঘুষ নেন না, তাঁর গবেট ছেলেটিকে মোটা মাইনেতে চাকরি দিতে হবে অথবা আরও হাজার রকমের চাহিদায় ঘুষের চারগুণ আদায় করবেন। দেশটা একেবারে গোল্লায় গেছে। এ জাতির আর ভবিষ্যৎ নেই—

হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ি পৌঁছাইতেই সদানন্দবাবু ঘড়ির দিকে

চাহিয়া বলিলেন—যাক, এখনও পাঁচ মিনিট সময় আছে। সাতটা দশের গাড়িটাই পাওয়া যাবে।

শিবনাথবাবু বলিলেন—না হয় পরের গাড়িটাতেই যাবেন। টিকিট কাটতে হবে—তাড়াহুড়া করবেন না।

গাড়ি হইতে নামিতে নামিতে সদানন্দবাবু বলিলেন—না, টিকিট কাটতে হবে না—মান্থলি আছে।

অবাক হইয়া মঞ্জু জিজ্ঞাসা করিল—মান্থলি! তোমার আবার মান্থলি টিকিট কিসের রাঙ্গাদাহু?

যাইতে যাইতে সদানন্দবাবু জবাব দেন—তোর বড়মামার মান্থলিটা নিয়ে এসেছিলাম। বলিয়াই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

চোখ বড় বড় করিয়া মঞ্জু কহিল—দাহু, এটা কি রকম হলো?

হো-হো করিয়া হাসিতে হাসিতে শিবনাথবাবু বলিলেন—বুঝলে না গিন্নী, আমরা সবাই রাজা······!



"নান্য পন্থা"



গোলগাল চেহারার ভোলানাথবাবু হাড়-বার-করা একখানা চেয়ারে বসে আছেন। পাশে ধূমায়িত এক কাপ চা। একটা পুরানো রং-চটা অ্যাসট্রে--যদিও পোড়া বিড়ি আর সস্তাদামের সিগারেটের টুকরাগুলি বাইরেই ছড়িয়ে পড়ে আছে বেশী। খিট-খিটে মেজাজ। কর্মচারীদের ধমকাচ্ছিলেন। এমন সময় রোগাপটকা এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বললেন, "নমস্কার, নমস্কার"। ভদ্রলোকের দিকে না তাকিয়ে ভোলানাথবাবু পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন।

"আজ্ঞে আমার নাম অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ পাশের লাল বাড়ীটাতেই থাকি, অবশ্য 'ভীষ্মদেব' ছদ্মনামেই আমি লিখি।"

"তা ছদ্মনামে কেন? মার খাবার ভয়ে, না পাওনাদারের তাগাদা এড়াতে!"

"কি যে বলেন স্যার! তা, এই বইখানি লিখেছি—'মোহময়ী মোহিনী'। নামটা ভাল হয়নি স্যার?" বলেই অনন্তবাবু পাণ্ডুলিপি-গুলি পাশে রেখে কভারের ডিজাইনটি ভোলানাথবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "দেখুন দেখি স্যার, ডিজাইনটা কেমন হয়েছে?"

"ভীষ্মদেব মশাই, আপনার কাহিনীর সঙ্গে নামটা মিলেছে মন্দ নয়। মানে না মানা ব্লাউজ, পথনির্দেশ শাড়ী আর পুরনো সোডার বোতলের মত চেহারা—অদ্ভুত সমাবেশ।" পাণ্ডুলিপিটা হাতে নিয়ে দু'চার পাতা পড়েই ভোলানাথবাবু আবার বললেন, "ভীষ্মদেববাবু!"

"আজ্ঞে!"

"আপনার নামটা পালটে রাখুন।"

"অ্যাঁ, কি বললেন? নাম পালটাবো?"

"হ্যাঁ। ওটাকে ইন্দ্রদেব করে দিন।"

বিগলিত হয়ে অনন্তবাবু বললেন, "আপনি বড় হাসাতে পারেন স্যার।"

"তা পারি, তবে আপনার বই আমি ছাপব না।"

"কেন? আমার পাবলিশার ক্যাশ টাকা দিয়ে ছাপবে, শুধু

পূজার আগে বইটা বেরনো চাই, এই যা।"

"হ্যাঁ, আপনার পাবলিশার টাকা দেবে, কারণ এসব অশ্লীল বইয়ের কাটতি আছে। তবে কি জানেন মশাই? আপনি না হয় ছদ্মনামের আড়ালে গা-ঢাকা দিলেন, কিন্তু আমার এই বুড়ো বয়সে পুলিসের হাঙ্গামা পোষাবে না।"

জোড়হাতে নমস্কার করে ভোলানাথবাবু আবার বললেন, "আপনি এবার আসুন, আমার অনেক কাজ।"

"ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না"—বলতে বলতে ক্ষুণ্ণ হয়ে অনন্তবাবু বেরিয়ে গেলেন।

অনন্তবাবুর যাওয়ার পথের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভোলানাথবাবু বলে উঠলেন, "যত সব হাড়-হাভাতের দল।"

পরদা ঠেলে পুরনো বন্ধু ঘনশ্যামবাবু ঘরে ঢুকেই ভোলানাথ-বাবুকে লক্ষ্য করে বললেন, "কি ব্যাপার হে ভোলানাথ, ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই একি সম্ভাষণ?"

"আরে ঘনশ্যাম যে, বসো হে বসো"—বলেই পেছনের দরজার দিকে তাকিয়ে ভোলানাথ হাঁক দিলেন, "কেষ্টা, দু' কাপ চা দিয়ে যা।"

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঘনশ্যামবাবু বললেন, "তা, চা খাওয়াচ্ছ, খাবো, কিন্তু খদ্দেরটিকে তাড়ালে কেন? সেদিন বলছিলে কাজকর্ম নেই, এদিকে ক্যাশপার্টি দেখে তোমার নাম রেকমেণ্ড করলাম। অবশ্য আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল......"

ভোলানাথবাবু রেগে বললেন, "তুমি পাঠিয়েছিলে? কিন্তু জানো কি ধরনের নোংরা বই ছাপাতে এসেছিল?"

থামিয়ে দিয়ে ঘনশ্যামবাবু বললেন, "আরে বাবা, চটলে চলবে কেন? আজকাল এসব জিনিসেরই বাজার। এর নাম সাহিত্য।"

"তা হোক। আমাকে দিয়ে এসব কাজ চলবে না।"

"চলবে না? বুঝলে ভায়া, একথা আমিও ভাবতাম। কিন্তু বাঁচতে হবে তো!"

"তার মানে, কি বলতে চাও তুমি?"

কেষ্টা ছু' কাপ চা রেখে গেল। এক কাপ চা ঘনশ্যামবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে ভোলানাথবাবু দ্বিতীয় কাপটি নিজের দিকে টেনে নিলেন।

চা'য়ে চুমুক দিয়ে ঘনশ্যামবাবু বলতে শুরু করলেন, "বুঝলে হে, আদর্শ আমারও ছিল। সত্যিকারের শিল্প ও রুচিজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে কতকগুলি নাটক নামিয়েছিলাম। খবরের কাগজে ফলাও করে প্রশংসাও বেরিয়েছিল। কিন্তু কি হলো? ব্যাংকে যা ছিল সব গিয়ে শেষে বাড়ীটাও বাঁধা পড়েছিল।"

"তোমাকে কিন্তু তখনি বার বার মানা করেছিলাম ঘনশ্যাম—"

"তা অবশ্য করেছিলে। কিন্তু তুমি তো জানো, ছোট বয়স থেকেই আমার ঐ সর্বনেশে নেশা। তবে হ্যাঁ, এবার শেষ চেষ্টা করে কিন্তু অবস্থাটা আবার প্রায় ফিরিয়ে এনেছি।"

"কি করে?" চায়ের কাপটা একপাশে সরিয়ে রেখে ভোলানাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

মৃদু হেসে ঘনশ্যামবাবু বললেন, "আরে বাবা, তুমি তো তোমার এই টিংটিং-এ প্রেসটার বাইরের কোন কিছু খবর রাখ না। আমার যুগবিপ্লবী নাটক 'রাতের বান্ধবী'র কালকে হীরক-জয়ন্তী।"

"সে তো শুনেছি একটা অশ্লীল নাটক?"

"ঠিক কথাই শুনেছ। এ নাটক আমিও বসে দেখতে পারি না। 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' ছাপ মেরে বাইরে বসে থাকি। ভেতরে অবশ্য অপ্রাপ্তবয়স্কদের ভীড়ও নেহাত কম থাকে না। এদিকে দেখ, কাগজে দুর্নাম বেরিয়েছে প্রচুর। অশ্লীল, আদিরসপ্রধান নাটক, নোংরামির চূড়ান্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে হ্যাঁ, পয়সা দিচ্ছে—শহর যেন ভেঙ্গে পড়েছে।"

ভোলানাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, "তুমি এভাবে পয়সা

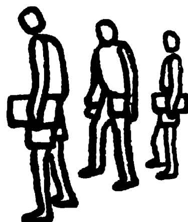
রোজগার করছ।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘনশ্যামবাবু জবাব দিলেন, "কি করবো ভাই, দেশটা কোনদিকে যাচ্ছে দেখছ না? পত্রপত্রিকাগুলি ছেলে-মেয়েদের ভয়ে লুকিয়ে ফেলতে হয়। থিয়েটার-সিনেমায় যৌন ছবি না থাকলে চলে না। জাতির চরিত্র কোন্ দিকে চলছে বুঝতে পারছ না?"

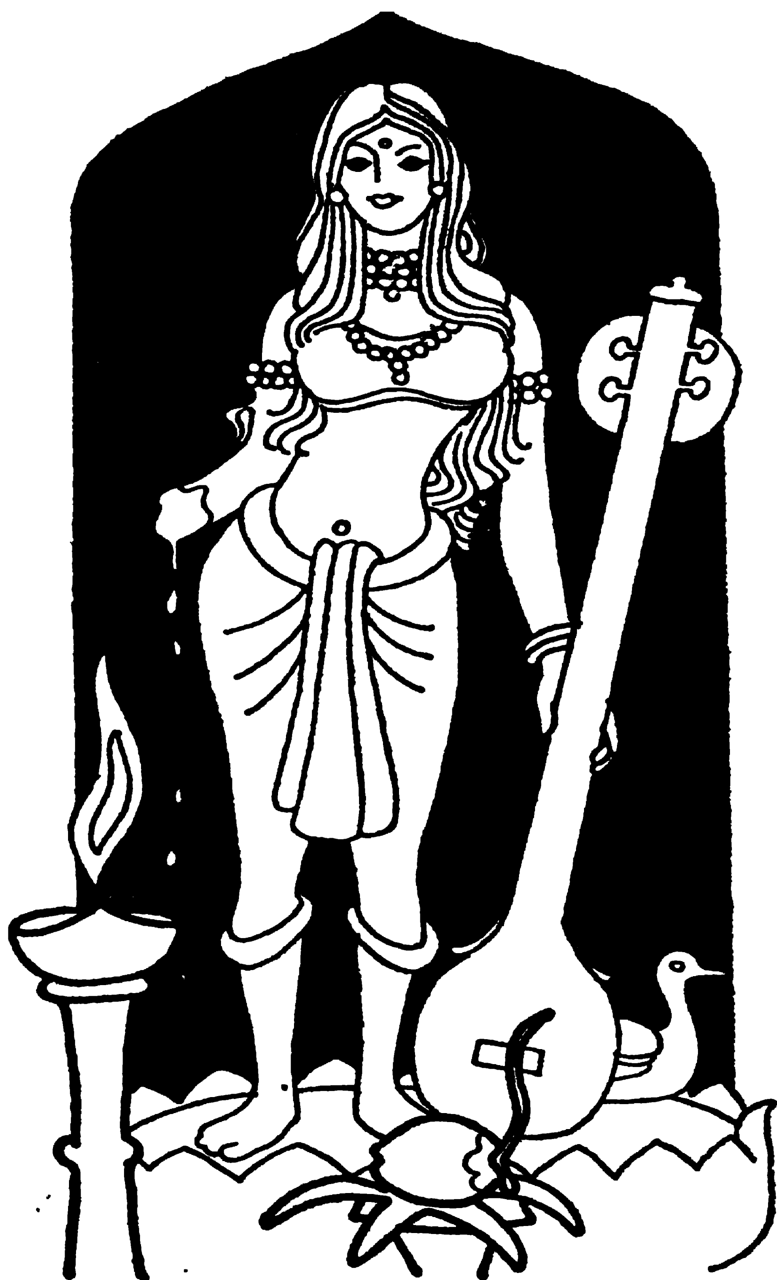
"সব বুঝি"—ভোলানাথবাবু ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠলেন। "কিন্তু এসবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলব কি করে?"

দাঁড়িয়ে উঠে ঘনশ্যামবাবু বললেন, "তা না হলে যে তলিয়ে যেতে হবে ভায়া"—বলেই ফুটপাতে গাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভোলানাথবাবু হাঁক দিলেন, "কেষ্টা, ঐ যে কোণের লাল বাড়ীটা, ওখান থেকে যে বাবুটি বই ছাপাতে এসেছিল, তাকে একবার গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় তো।"



বারোয়ারির শক্তিশেল



গৌদলপাড়ার 'কৃষ্টি সংসদ' সভা ডাকিয়াছে, আলোচ্য বিষয় সরস্বতী পূজা। হ্যাপ্‌লা, তিনে, ট্যাঁপা, রাজেন, ভ্যাব্‌লা ও রতন —সবাই আসিয়া পড়িয়াছে। আসে নাই শুধু পালের গোদা গোঁপেদা, ওরফে গোপাল।

চারমিনারে টান মারিয়া হ্যাপ্‌লা বলিয়া উঠিল, "গোঁপেদার আর সময়-জ্ঞান হবে না। দশটায় মিটিং ডেকে উনি এগারোটা পর্যন্ত ভেরেণ্ডা ভেজে চলেছেন।"

ট্যাঁপা হ্যাপ্‌লার হাত হইতে চারমিনারটা কাড়িয়া লইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে সায় দিয়া বলিয়া উঠিল, "শালা, এ জন্যেই বাঙ্গালী জাতটার কিচ্ছু হয় না। দেখ, শালা সাহেবদের—"

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় তিনে বলিয়া উঠিল, "আর বকাইস্ না। সাহেবরা সরস্বতী পূজা করে না।"

বিরক্ত হইয়া তিনে সুপারি চিবাইতে থাকে। এমন সময় দূরে গোপালকে আসিতে দেখিয়া রাজেন সকলকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিল, "গুল্‌তানি থামা দেখি, গুরু আসছে।"

"কি রে, তোরা সব এসে পড়েছিস?" বলিয়াই গোপাল তক্তাপোশের একপাশে বসিয়া পড়িল।

"এতো দেরী করলে গোঁপেদা, আর ক'টা দিন মাত্র বাকী!"

"থাম্ দেখি ভ্যাব্‌লা, গোঁপেদার যেন আর চিন্তা নেই!" একটা সিগারেট গোপালের দিকে বাড়াইয়া দিয়া পট্‌লা তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "গুরু, এবার কাজের কথায় আসা যাক।"

আলগোছে সিগারেটটা তুলিয়া লইয়া দেশলাইয়ের উপর ঠুকিতে ঠুকিতে চিন্তিতভাবে গোপাল বলিতে আরম্ভ করিল, "ত্থাখ, এবার চাঁদার হার বাড়াতে হবে। জিনিসপত্তরের দাম বেড়ে গেছে, তা ছাড়া এর পরে তো বাকী রইল মাত্র রবীন্দ্র-সম্মেলন। তারপর আবার তো সেই দুগ্‌গাপূজা। শালা, ক্লাব চালাতে হবে না?"

আমতা আমতা করিয়া রাজেন বলিয়া উঠিল, "কিন্তু গুরু,

লোকে আর দেবেই বা কত? এদিকে পাড়ায় দিনের পর দিন পুজোর সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে।"

সায় দিয়া টঁ্যাপা বলিয়া উঠিল, "আবার শালা সরকার চোখ রাঙাচ্ছে। চাঁদার জন্য হামলা করা চলবে না। যত্তো সব! দেশটাকে শালা অধঃপাতে নিয়ে গেল।"

"ঠিক বলেছিস, বে-পাড়ায় চাঁদা চাওয়া চলবে না, হামলা করা চলবে না—পেয়েছে কি? সোজা আঙুলে কি ঘি ওঠে? আমি তো গজেন্দ্রবাবুকে বলে দিয়েছি—ভোটের জন্যে আবার আমাদের তেল দিতে হবে। যত সব বেধর্ম্মী!"

"থাম থাম, ওসব অনেক শুনেছি।" বিরক্ত হইয়া গোপাল বলিয়া উঠিল, "টেক্‌নিক্ পালটাতে হবে। শুধু পুজো বলবি কেন? বলবি রজত-জয়ন্তী। তারপর কাল্‌চারাল্ ফাংশান, দরিদ্রনারায়ণ সেবা, গরীব ছেলেদের বিনামূল্যে বই দেওয়া হবে—মানে, যেখানে যেটার দরকার।" সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়াই সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি রে! মাথায় কথাগুলি ঢুকলো? হ্যাঁ, ভাল কথা। যেখানেই যাবি, দল বেঁধে যাস্, বুঝলি?" চারিদিকে চাহিয়া ভোম্বলকে দেখিতে না পাইয়া গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "ভোম্বলের খবর কি র‍্যা? সোভেনীরের ভার নিয়ে একেবারে বেপাত্তা!"

"সোভেনীর সম্বন্ধে তোমাকে ভাবতে হবে না গুরু, ভোম্বলের দাদা পাবলিসিটি অফিসে কাজ করে। বাবা সরকারী বড় চাকরে, আবার টেঁপিদির বর নাকি বেশ জাঁদরেল অফিসার। বিজ্ঞাপন ম্যানেজ করা ওর হাতের মুঠোয়। তুমি বরং লাহিড়ীবাবুকে একটু বলে দিও, শুনেছি ওনার হাতেই নাকি লাইসেন্স দেবার ক্ষমতা।"

হ্যাপ্‌লাকে থামাইয়া দিয়া গোপাল বলিয়া উঠিল, "ঠিক আছে। আমার যা করবার আমি করে দেবো। তবে মনে রাখিস্, গতবার মাত্র পনের হাজার টাকা উঠেছিল। এবার···"

তিনে কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, "টাকার কথা রাইখ্যা

এখন আসল কথায় আস তো লিডার। গত বছর আমড়াতলা আমাগো একেবারে ব্যা-ইজ্জত কইরা দিল। সেরেফ নারকইলের ছোবরার ঠাকুর বানাইয়া—"

পটলার মনে মনে অনেকদিন ধরিয়া ভ্যাব্‌লার উপর একটা আক্রোশ ছিল। সুযোগ পাইয়া বলিয়া উঠিল, "কেন করবে না? কতবার বারণ করলাম, ভোম্বল, মোমের ঠাকুর গড়িস না। গরীবের কথা ভাল লাগবে কেন? উনি গেলেন আর্ট দেখাতে—কেমন হলো তো?"

ভ্যাব্‌লা চটিয়া লাল হইয়া মুখ ভেংচাইয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, যত দোষ আমার! কেন, প্রদীপটা অত কাছে রাখতে কে বলেছিল?"

তারপর গোপালকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "বুঝলে গোঁপেদা, অঞ্জলি দিয়ে মাকে প্রণাম করেই মাথা তুলে দেখি, মা সরস্বতীর হাতখানাই গলে গেছে। বোঝ দেখি? পরীক্ষার বছর—ঐ জন্যেই তো অত টুকেও পাস করতে পারলাম না। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ছেলেখেলা!"

রাজেন সকলকে শান্ত করিয়া বলিয়া উঠিল, "যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর সময় নষ্ট করে কি হবে! এবার ঠাকুর কিসের করা হবে সেই পরামর্শ কর।"

পটলা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, এবার ছাতুর ঠাকুর গড়লে কেমন হয়?"

মাথা নাড়িয়া ভোম্বল বলিয়া উঠিল, "না-না-না। গতবার পঞ্চদল ক্লাব ছাতুর ঠাকুর করেছিল।"

বিরক্ত হইয়া রাজেন বলিল, "চালের ঠাকুর, ডালের ঠাকুর, মাছের আঁশের ঠাকুর, বাঁশের ঠাকুর—সব হয়ে গেছে। শালা, আর কি বাকী আছে গুরু?"

সুযোগ পাইয়া তিনে বলিয়া উঠিল, "আইচ্ছা, এইবার একখান্ পুলিপিঠার ঠাকুর গড়াইলে ক্যামন্ হয়? পিসিমা যা পুলিপিঠা

বানাইয়া ছিল না!" বলিয়া তিনে চুক্ চুক্ করিয়া জিভের শব্দ করিয়া উঠিল।

"থাম বাঙাল। খাবারের জিনিসের নামেই নোলায় জল এসে গেল।" গোপালের দিকে চাহিয়া ভ্যাব্‌লা বলিয়া উঠিল, "বুঝলে গোঁপেদা, পুলিপিঠের ঠাকুর পাহারা দেবার জন্য ওকে যেন রেখো না, শালা খেয়েই শেষ করবে।"

সবাই হাসিয়া উঠিল।

ইঙ্গিতে সকলকে থামিতে বলিয়া গোপাল বলিয়া উঠিল, "তিনের কথাটা হেসে উড়িয়ে দিসনে। কথাটা নেহাত মন্দ বলেনি। পুলিপিঠের ঠাকুর—শালা, একখানা ওরিজিন্যাল্ আইডিয়া। তোরা কি বলিস্?"

"ঠিক আছে গুরু। তোমার সঙ্গে আমরা কবে আর দু'মত হয়েছি?" সবাই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া উঠিল।

"ন্যাপ্‌লা, নোট কর্"—গোপাল ন্যাপ্‌লার কাছে কাগজ-পেনসিল আগাইয়া দিল।

নোট করিতে করিতে ন্যাপ্‌লা জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরের মুখ কার মত গড়তে বলব?"

"সুচিত্রা সেন।"

"সায়রা বানু।"

মার-মার করিয়া পট্‌লা বলিয়া উঠিল, "অ্যাই ভ্যাব্‌লা, বাংলা দেশে থাকতে আমরা বাইরের জিনিস নেব কেন? সায়রা বানু কি বাঙ্গালী? বাঙ্গালীর একটা কাল্‌চার নেই?"

রাগিয়া গিয়া ভ্যাব্‌লা ভেংচি কাটিয়া বলিল, "বাঙ্গালী! আহা রে, এতই যদি তোমাদের বাঙ্গালী-প্রীতি, তবে পূজার সময় একটানা হিন্দী গান বাজাও কেন? একখানাও ে বাংলা গান বাজাতে শুনি না।"

"মুখ সাম্‌লে কথা বলবি ভ্যাব্‌লা।" একটু থেমে গোপ সাক্ষী মানিয়া বলিল, "তুমিই বল না গোঁপেদা, গত বছ

নটবর' গানখানা অন্ততঃ বার পঞ্চাশেক বাজায়নি ?"

বিরক্ত হইয়া গোপাল বলিল, "তোরা বড্ড ছোটখাট জিনিস নিয়ে মাথা গরম করিস। আরে বাবা, হিন্দী গান বাজানোর একটা বিশেষ কারণ আছে। দেখছিস না, ভাষা-ভাষা করে দেশটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। আমরা তবু সব ভাষার গান বাজিয়ে ভাষার আর দেশের ঐক্য বজায় রাখছি।"

"সারা ভারতে কি শুধু দুটো ভাষাই আছে না কি ?"—ভ্যাব্‌লা পাল্টা প্রশ্ন করে।

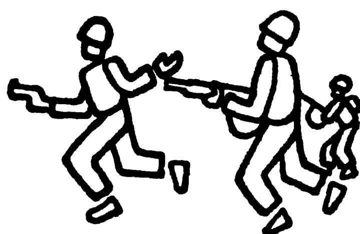
"তা না থাকুক, তবে মাইকে বেজে বেজে দু'শ রকমের ভাষা বেরোয় না ? নে, মেলা বকতে হবে না। ঠাকুরের মুখ কেমন হবে, পরে ঠিক করা যাবে। এখন চাঁদার লিষ্টি নিয়ে বেরিয়ে পড়। হ্যাঁ, ভাল কথা, এবার যারা বাইরে বেরোনোর ছুতো করে দুর্গাপুজো আর কালীপুজোর চাঁদা ফাঁকি দিয়েছে, তাদের বেশ করে কড়কে দিবি, বুঝলি ?"

*　　　*　　　*

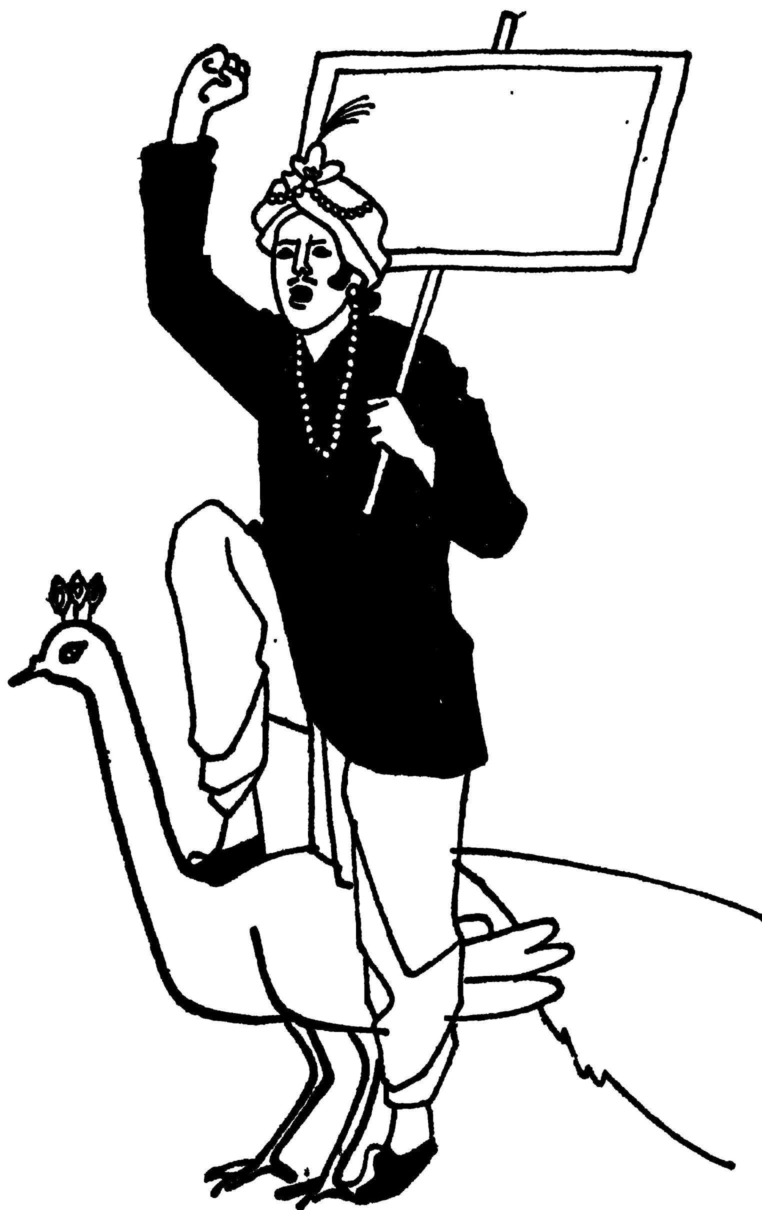
পূজা যথা সময়ে হইয়া গিয়াছে। মা সরস্বতী আসিয়াছিলেন কিনা জানি না—তবে পুলিপিঠার সংখ্যা মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত-ভাবে কমিয়া যাওয়ার ফলে ঠাকুর গড়িতে সময় অনেক বেশী লাগিয়াছে। এদিকে পূজার দিন মূর্তি দেখিয়া পুরোহিত মহাশয় বাঁকিয়া বসার দরুন অনিচ্ছাসত্ত্বেও একখানা ছোট মাটির ঠাকুর কিনিয়া পূজা করা হইয়াছে। অবশ্য, মূর্তিখানিকে লোকচক্ষুর অন্তরালেই রাখা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, মাটির ঠাকুরের দাম পুরোহিত মহাশয়ের পাওনা-গণ্ডা হইতেই বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহার জন্য ক্লাবের ক্যাশে হাত পড়ে নাই। পুরোহিত মহাশয় তিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি আর এই প্রফেশনে থাকিবেন না। মাত্র পুত্রকে লইয়া পরের মরশুমেই মাইকের ব্যবসায়ে পড়িবেন। ঠেকিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, পূজায় পুরোহিত ইকের ডিমাণ্ড অনেক বেশী।

ঠাকুর প্রায় তিনদিন রাখা হইয়াছিল। দৈনিক লক্ষ লক্ষ দর্শক বিগলিতচিত্তে ঠাকুর-দর্শন করিয়া গিয়াছেন। চারিদিকে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গিয়াছিল। কোন কোন খবরের কাগজে ফলাও করিয়া প্রশস্তিও বাহির হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতিমা বেশী দিন মণ্ডপে রাখা সম্ভব হয় নাই, কারণ পুলিপিঠায় পচন ধরিয়াছিল।

ওদিকে আমড়াতলার মুখ চুন হইয়া গিয়াছে। এবার তাহারা বরফের ঠাকুর গড়িয়াছিল। সরকারের ঘোষণামত পূজার সময় লোড-সেডিং না হইলেও, পূজার আগের দিন লোড-সেডিংয়ের দরুন এয়ার-কণ্ডিশনিং কাজ করে নাই। ফলে, পূজার পূর্বেই সরস্বতী ঠাকরুণ উদ্যোক্তাদের সমস্ত ভক্তিরসকে উপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে তরলাকারে মণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সমবেত সভ্যগণ পাখার হাওয়া করিয়াও সরস্বতী ঠাকরুণকে স্বরূপে রাখিতে পারেন নাই। প্রতিমাবিহীন মণ্ডপে বসিয়া সভ্যগণ আগামী বছরের জন্য লোহার ঠাকুরের বায়না দিয়াছেন।



সমাধান



দেবরাজ ইন্দ্রের নামে অনাস্থা প্রস্তাব আসিয়াছে। দেবস্থানে এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। সারা স্বর্গরাজ্যে ভীষণ গণ্ডগোল। পৃথিবী হইতে আগত মনুষ্যরাও যুব-দেবতাদের লইয়া সমানে ঘোঁট পাকাইয়া যাইতেছেন। নারদমুনি মাঝে মাঝে দুই দলেই ইন্ধন যোগাইয়া যাইতেছেন। কার্তিক, গণেশ, পবন প্রভৃতির দাপাদাপি স্বর্গরাজ্যে নতুন বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। এইমাত্র খবর আসিয়াছে, কিছু বয়স্ক দেবতাও ক্ষমতার লোভে যুবক দেবতাদের দলে যোগ দিয়াছেন। নারদমুনি মারফত নিজে দলের সমস্ত সদস্যদের খবর পাঠাইয়াছেন, যে-কোনদিন বিনা নোটিসে স্বর্গের বিধানসভা ডাকা হইতে পারে।

স্পীকার—দেবগুরু বৃহস্পতিকে পাওয়া যাইতেছে না; লোক পরম্পরায় শোনা যাইতেছে, উনি এখন বিষ্ণুলোকে হাওয়া বদল করিতে গিয়াছেন। আশা করা যাইতেছে, দুই-এক দিনের মধ্যেই দেবগুরু বৃহস্পতি রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দেবাদিদেবের নিকট হইতে সমস্ত খবর চাপিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ নেশাখোর ভদ্রলোকের সভা ভঙ্গ করিবার ক্ষমতা অপরিসীম। তাহার পর, কাহাকে কখন কি বর প্রদান করিয়া বসেন—যাহার ঠেলা সামলাইতেও দেবরাজের হেনস্থার সীমা থাকে না।

বিরোধী পক্ষের প্রথম দাবী হইল: "অবিলম্বে নির্বাচন চাই।" চারিদিকে রঙ-বেরঙ-এর পোষ্টারে পোষ্টারে স্বর্গরাজ্য ছাইয়া গিয়াছে। মিছিলে মিছিলে পথ চলাই দায়! সর্বত্র একটাই শ্লোগান: "চলবে না, চলবে না।"

কার্তিক এক মহতী সভার আহ্বান করিয়াছেন। শুক্রবার সায়াহ্নে দেবাকীর্ণ সভায় বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া তিনি তেজস্বিনী ভাষায় দেবগণকে শ্রেণী-ধর্ম নির্বিশেষে দলে দলে তাঁহার পক্ষে যোগদানের জন্য আহ্বান করিতেছিলেন: "বন্ধুগণ, আপনাদের

নিজেদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। পুষ্টিকর আহারের অভাবে আপনাদের দেহ শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইতেছে। অমর বরের ফলে মরিয়াও অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই। বৃদ্ধ অক্ষম ক্ষমতালোভী দেবতাদের জন্যই আজ আমাদের এই অবস্থা। নরগণের পূজাই আমাদের একমাত্র উপার্জন। কিন্তু দেখুন, দেবরাজের কাজের গাফিলতির দরুন কোথাও অনাবৃষ্টিতে খরা, আর কোথাও অতিবৃষ্টির ফলে বন্যায় পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। মর্তে কাহারও আর দেবপূজা করিবার মত মনের অবস্থা নাই। দেবতাদের উপর দিনের পর দিন তাহাদের আস্থা কমিয়া যাইতেছে।

"প্রচারমন্ত্রী নারদমুনি সেদিন বলিতেছিলেন, তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন—হরির নাম এখন হরেবোল্ হইয়া গিয়াছে। পূর্বে তবু অন্ততঃ মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় হরির নাম করিত। এখন পৌত্রগণ পিতামহীর মরদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় নূতন শ্লোগান শুরু করিয়াছে: 'ঠাকুর-মা যাচ্ছ কোথায়? জবাব দাও, জবাব দাও।'

"আপনারা বিবেচনা করুন, আমাকে দেবসেনাপতি করা হইয়াছে, কিন্তু তীর-ধনুক ছাড়া আমাকে কোন অস্ত্র দেওয়া হয় নাই। আর দেখুন, বাহনটিও ময়ূর। ইহা দ্বারা সিনেমায় নামা হয়তো চলে, কিন্তু ইহা সম্বল করিয়া আধুনিক যুগে যুদ্ধ? অসম্ভব। দেবরাজ নিজের বজ্রটি নিজের হাতে রাখিয়াছেন, বিষ্ণুও তাঁহার অস্ত্র সম্বন্ধে অতিমাত্রায় যত্নবান। এমনকি, পিতৃদেব নেশা-ভাঙ করিলেও আসলে সেয়ানা। নিজের পাশুপতখানা হাতছাড়া করেন নাই। আমাদের নামে শুধু অপবাদ, আমরা নাকি বিখ্যাত হইবার জন্য ন্যায়-অন্যায় কোন কিছু করিতেই পিছ-পা নই। যেন তাঁহারাই সৎপথে থাকিয়া আজ দেবরাজের মাথার উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। দুই-একটা ছোটখাটো ব্যাপার এইদিক সেইদিকে হইয়াছে তো কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়াছে? ক্ষমতায় আসিতে পারিলে ঐ আগাছা কয়টাকে সরাইতে আর কয়দিন

লাগিবে ?”

কার্তিক আসন গ্রহণ করিতেই শনি কালো চশমা পরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, “বন্ধুগণ, আমি এ বয়সেও দেবরাজের ভাঁওতায় তিক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া আপনাদের দলে যোগদান করিয়াছি। দেবরাজ স্বর্গে শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টি করিবেন বলিয়া এতদিন আমাদের আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ দেখুন, বড় দেবতাদের তোষামোদ করা আর অপ্সরাগণকে লইয়া প্রমোদবিহার ছাড়া তাঁহাকে কোথাও দেখিয়াছেন কি ? তাঁহার নিজস্ব জন-সম্পদের বিভাগটির কথা আপনারা ভাগিনেয় কার্তিকের কাছেই শ্রবণ করিয়াছেন। বিষ্ণুর বিভাগের কাজও তথৈবচ। একচক্ষু প্রচারমন্ত্রী নারদ নারায়ণ ছাড়া কাহারও কথা প্রচার না করিলেও নিজের ক্ষমতাবলেই ভয় দেখাইয়া গ্রামাঞ্চলে কিছু পূজা-পার্বণের বন্দোবস্ত করিয়া কোন প্রকারে কালাতিপাত করা যাচ্ছিল। এখন খরা ও বন্যায় তাহাও গিয়াছে। শহরাঞ্চলে প্রচার ছাড়া কোনও কাজ হয় না। সুতরাং, আমার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এদিকে অভুক্ত অবস্থায় চক্ষুর অবস্থা সঙ্গীন, ছানি পড়িয়াছে। ভস্ম করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ রহিত। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের দর্শনী যোগাড় করা আমার সাধ্যাতীত। আপনারাই বিচার করুন, আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী কে ?”

গণদেবতা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। শনিঠাকুর বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে শুরু করিলেন, “বন্ধুগণ, আমিও শনিমামার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। যদিও সমস্ত পূজার পূর্বে আমাকে আহ্বান করিতে হয়, কিন্তু তাহা নিছক করুণা প্রদর্শন করিয়া নহে। নেহাত আমার অধীন বড় বড় ব্যবসায়ীগণ রহিয়াছেন বলিয়া এবং তাঁহাদের অর্থ ব্যতিরেকে কোন বৃহৎ পূজা-পার্বণ সম্ভব নহে বলিয়াই আমার কিঞ্চিৎ কমিশনের ব্যবস্থা। কিন্তু আজ বিচার করিয়া দেখিবার দিন আসিয়াছে। যাহাদের কোনও কাজকর্ম করিতে হয় না, তাহাদের জন্য হস্তী,

অশ্ব, সিংহ, রথ, মহিষ, ষণ্ড প্রভৃতি বাহনের ব্যবস্থা, আর আমার এই বিপুল দেহের বাহন ক্ষুদ্রকায় ইঁদুর। আমাকে বড় বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করিতে হয়। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। বেশীর ভাগ সময় তাহাদের গাড়ী করিয়াই ঘুরিয়া বেড়াই, শুধু মফঃস্বলে যাতায়াতের সময় বহু সন্তর্পণে বাহনটিকে ব্যবহার করি। যেখানে যত প্রকারের গাফিলতির ব্যাপার ঘটিবে, অমনি দলনির্বিশেষে আমার ভক্তদের উপর দোষ চাপানো হইয়া থাকে। শুধু কি এখানেই তাঁহারা থামিয়াছেন? আমার ক্ষুদ্র বাহনটিকেও ইঁহারা রেহাই দেন নাই। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লোপাট করিয়া আমার বাহনটির উপর দোষ চাপাইয়া দেওয়া হয়। এমনকি লৌহাদি পর্যন্ত আমার বাহনটি ভোজন করিয়াছে বলিয়া প্রচার করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। দেবরাজ ইন্দ্রকে জানাইয়াছিলাম, কোন ফল হয় নাই। পরন্তু ইঁদুর মারিবার ঔষধের ফরমুলা মনুষ্যদের জানাইয়া দিয়াছেন। শ্রেণীহীন সমাজের রূপ আপনারাই বিচার করুন।”

গণদেবতা আসন গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মীদেবী চটিয়া গিয়া বলিতে শুরু করিলেন, “শুধু শুধু কর্তৃপক্ষের দোষ দিয়া কোন লাভ হইবে না, প্রতিকার চাই। আমার অবস্থা লক্ষ্য করুন। কালো টাকায় কালো টাকায় আমার স্বর্ণবর্ণ কালো হইয়া গিয়াছে। সাদা টাকা করের মাধ্যমে সরকারের ঘরে যাইয়া নানা অছিলায় ভূত-প্রেতদের পকেটে চলিয়া যাইয়া আমার অবস্থা আরও সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে। এখন সম্মান লইয়া বাঁচাই মুশকিল।”

কার্তিক বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ভগ্নী ঠিক কথাই বলিয়াছেন। তবে ভূত-প্রেত প্রসঙ্গ লইয়া বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক হইবে না। শোনা যাইতেছে, এবার ভূত-প্রেতদেরও ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হইবে। আর আমরাও প্রয়োজনবোধে ইহাদের কাজে লাগাইতেছি।”

সভা হইতে ধ্বনি উঠিল, “সাধু, সাধু।”

সরস্বতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে শুরু করিলেন, "বিষ্ণুর কাজের নমুনা দেখুন। পৃথিবীর লোকদের লালন-পালনের দায়িত্ব তাঁহার। কিন্তু তিনি কি করিতেছেন? বাংলাদেশে লেখাপড়ার পাঠ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কোথাও বঙ্গভাষী লোক বেশী থাকিলেও অ-বঙ্গভাষায় তাহাদের পরীক্ষা দিতে হইবে—এদিকে বাংলাদেশে সব ভাষাতেই পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশে ভক্তগণ সমানে বিক্ষোভ করিয়া যাইতেছে। কতদিন আমি তাঁহাদের উদারতা দেখাইতে বলিব? দুই দিক সামলাইয়া চলা কি সম্ভব? আমারও দেহমন সুস্থ নহে। পঁচিশ বৎসর হিন্দী শিখিতে ব্যয় হইয়াছে, অসমীয়া শিখিতে কয় বছর লাগিবে কে জানে? এদিকে পরীক্ষায় নকলের চর্চা বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্বে তবু বই দেখিতে দিলেই চলিত, এখন আবার উত্তর বাহির করিয়া দিবার দায়িত্ব লইতে হয়। এই খাটুনির জন্য কোনও বাড়তি পূজার বন্দোবস্ত নাই। এইভাবে চলিতে থাকিলে কয়দিন আর ভূতের বোঝা টানা যাইবে?"

এমন সময় বিশ্বকর্মা সভামধ্যে প্রবেশ করিতেই দেবতাগণ হৈ হৈ করিয়া উঠিলেন, "আপনি আবার এদিকে কেন? দাদাদের তৈলমর্দন করুন।"

বিশ্বকর্মা হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "দেবলোকবাসিগণ, আমি দলত্যাগ করিয়াছি। দুই-চারিদিন হইল পৃথিবী হইতে আসিয়াছি, এবার আমার পূজা নামমাত্র হইয়াছে। বহু কল-কারখানা বন্ধ। কিছু বন্ধ করিয়াছে কর্তৃপক্ষ, কোথাও করিয়াছে কর্মিবৃন্দ। অবশ্য বৈদ্যুতিক কারণ ও ব্যাঙ্কের অবিমৃষ্যকারিতাও বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছে। লোকপরম্পরায় কারণ যাহা শুনিলাম তাহাতে মনে হইল, ভাল কাজের জন্য পুরস্কার আর মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার—কোনটাই বর্তমান ব্যবস্থায় সম্ভবপর নহে। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন দলনেতাদের সঙ্গে কথা বলিয়া দেখিয়াছি, ভোটের ভয়ে অন্যায় বুঝিয়াও কেউ মুখ খুলিতে চাহেন না। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই এখন দলনেতাদের একমাত্র

কাজ।

"যাক্ সে কথা। এদিকে স্বর্গেও মর্তের ঢেউ লাগিয়াছে। কুবের ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকিবার দরুন কর্মচারিগণের মাহিনা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কারখানায় ধর্মঘটের নোটিস পড়িয়াছে। এদিকে কাঁচামালের অভাবে অনেক অর্ডার মঙ্গলগ্রহে চলিয়া গিয়াছে। সূর্যদেবের গাত্রের ফাটল ঝালাই করাতে বিলম্ব হওয়ায় সূর্যদেব চটিয়া গিয়াছেন, ভবিষ্যতে তিনি আর কোন অর্ডার স্বর্গে না পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দেবরাজের সঙ্গে দেখা করিয়াও কোন সুরাহা হয় নাই। এখন আপনারাই ভরসা।"

নারদমুনি আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছিলেন। বেগতিক দেখিয়া তিনি সটান দেবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

* * *

নারদমুনির আগমন-সংবাদ পাইয়া দেবরাজ তাঁহাকে গোপন মন্ত্রণাকক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

মন্ত্রণাকক্ষে গম্ভীরভাবে কুবের বসিয়া আছেন, অপর প্রান্তে অগ্নি, বরুণ এবং ধর্মরাজ নিজ নিজ আসনে সমাসীন, আর দেবরাজ পশ্চাতে হস্ত রাখিয়া অস্থিরভাবে পদচালনা করিতেছিলেন। নারদমুনিকে দেখিতে পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ মুনিবর?"

"নারায়ণ, নারায়ণ। খবর মোটেই সুবিধার নহে। এবার বিধানসভায় প্রচণ্ড ঝড়ের সংকেত দেখিতে পাইতেছি। এইমাত্র দেখিলাম, বিশ্বকর্মাও ঐ দলে যোগদান করিয়াছে।"

চমকিয়া দেবরাজ বলিলেন, "বিশ্বকর্মা ঐ দলে! অন্ততঃ তাহার তো কোন নালিশ থাকিবার কথা নয়।"

"নারায়ণ, নারায়ণ। আজ্ঞে, বৈদ্যুতিক অব্যবস্থা আর কুবেরের ব্যাঙ্কের গাফিলতি—দুই মিলিয়া বিশ্বকর্মার কারখানার পঞ্চত্বপ্রাপ্তির ব্যবস্থা হইতেছে। তদুপরি ক্রমবর্ধমান শ্রমিকদের দাবী। প্রথম

বয়সে চাকরি গ্রহণ না করিবার জন্য এখন পস্তাইতেছেন।"

কুবের ফুঁসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "পূজার পূর্বে প্রতি বৎসরই ব্যাঙ্কের ধর্মঘট হইয়া থাকে। উনি প্রবীণ লোক হইয়া যদি পূর্বাহ্ণে বন্দোবস্ত না করিতে পারেন, আমি একা কত দিক সামলাইব ?"

কুবেরকে ধমকাইয়া উঠিয়া দেবরাজ বলিলেন, "আপনার ওখানে ধর্মঘট হয় কেন ? ব্যাঙ্ক সরকারের অধীন। লাভ হইলে দেবসেবাতেই ব্যয়িত হইবে। বিশ্বকর্মার মত ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় ?"

কুবের ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "সে কথাটা আপনি একটু বুঝাইয়া বলিলে ভাল হইত। কর্মিগণ প্রতি বৎসর ধর্মঘট করিয়া বেতন বৃদ্ধি করাইয়াছে, আপনিও ভোটের ভয়ে ইহাদের প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন। ডিসিপ্লিন নামক বস্তুটি স্বর্গরাজ্য হইতে বিদায় লইয়াছে। এখন আমাকে দোষ দিয়া কি লাভ হইবে। দেখুন, আপনি যদি ধমক-ধামক দিয়া উহাদের সায়েস্তা করিতে পারেন।"

দেবরাজ বলিলেন, "বুঝিয়াছি, অপ্রিয় কাজ আমাকেই করিতে হইবে।"

নারদমুনি মার-মার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নারায়ণ, নারায়ণ। সর্বনাশ, ঐ কর্ম হইতে বিরত থাকুন—উহাদের প্রায় লক্ষাধিক ভোট আছে। আপনার সিংহাসনও খুব নিরাপদ নহে। এদিকে বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আসিতেছে। ভালভাবে বিবেচনা না করিয়া কোনও কাজে অগ্রসর হওয়াটা উচিত হইবে না।"

চিন্তিতভাবে দেবরাজ বলিলেন, "তাই তো, কি করা যায় !" ওদিকে উর্বশী, মেনকা, রম্ভা—উহারা গোঁ ধরিয়াছে। পৃথিবীর চিত্রতারকাদের ঐশ্বর্য দেখিয়া ইহারা ঈর্ষান্বিত।"

অগ্নিদেব ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "দেবরাজ, এখনও ইহাদের কথা চিন্তা করিতেছেন ! এদিকে আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। মর্তে বনজঙ্গল প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। কাঠের গৃহ নাই

বলিলেই চলে। আমার জীবনধারণ করাই সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। বিষ্ণুর শরণাপন্ন হওয়ায় নরগণকে বনমহোৎসবে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রদেশের রাজ্যপাল কর্তৃক একটি করিয়া বৃক্ষরোপণ ছাড়া ঐ উৎসবে আর কোন ফল হয় নাই। তবে হ্যাঁ, অনুষ্ঠানে কিছু নৃত্যগীতের প্রসার হইয়াছে। শ্মশানে পর্যন্ত বৈদ্যুতিক চুল্লি স্থাপিত হইয়াছে। আমি আমেরিকা চলিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছি। অন্ততঃ উহারাই আমার প্রয়োজন বোধ করিয়া ভিয়েৎনামে নেপাম বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়া আমার কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে।"

কুপিত হইয়া দেবরাজ কহিলেন, "তোমার আবদারের আর শেষ নাই। তোমার জন্য আমি বিদ্যুতের সরবরাহ কমাইয়া দিয়াছি। যাহার ফলে বিশ্বকর্মা পর্যন্ত আমার উপর চটিয়া গিয়াছে।"

ধর্মরাজ বলিলেন, "ওদিকে চিত্রগুপ্ত 'নিয়মমাফিক' কাজ শুরু করিয়াছে। ধর্মঘটের আর দেরি নাই। মর্তে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির দরুন মৃত্যুর হার হ্রাস পাইয়াছে। যুদ্ধাদিও নাই বলিলেই চলে। ফলে, ওভারটাইম কম হওয়াতেই এই বিক্ষোভ। বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে। আমার পক্ষে কার্য চালানো অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সরকার যমালয়ের কার্যভার গ্রহণ করিয়া আমাকে মুক্তি দিন।"

বরুণদেব সকলকে শান্ত করিতে করিতে কহিলেন, "স্বর্গরাজ্য এখন ভীষণ বিপদের সম্মুখীন। আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন, ব্যক্তিগত কোন্দল কাহারও পক্ষে শুভ নহে। আশু বিপদ হইতে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করুন।"

বরুণদেবের কথায় কাজ হইল। সবাই আপাততঃ শান্তভাবে পরামর্শ করিতে বসিলেন।

কুবের বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন, পূর্বে বিপদে-আপদে আপনারা দেবাদিদেবের স্মরণ লইতেন। আমার মনে হয়, তাঁহার উপদেশ

বিশেষভাবে প্রয়োজন···।”

“নারায়ণ, নারায়ণ। এখন ভোলানাথের কাছে কোন ফল-প্রাপ্তির আশা নাই। পূর্বে পৃথিবীর নৃপতিগণ ‘বিচার-আচার’ প্রভৃতির অনুশাসনকেই চরম বলিয়া মানিয়া লইতেন, কারণ ব্রাহ্মণদের কোন বৈষয়িক ব্যাপারে লোভ ছিল না। সুতরাং ন্যায্য বিচারেও তাঁহাদের কোন পক্ষপাতিত্ব করিতে হইত না। আমরাও সেভাবেই এতদিন ভোলানাথের নির্দেশ মানিয়া চলিতাম। কিন্তু এখন দেবাদিদেব বাঁকিয়া বসিয়াছেন। মা দুর্গা ছেলেদের পক্ষ লইয়া দেবাদিদেবকে শাসাইতে কসুর করেন নাই। গাঁজা-ভাঙের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়াতে দেবাদিদেবও আর স্বর্গরাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। বুদ্ধিধর্মী দেবগণও সুযোগ বুঝিয়া বুদ্ধিজীবী হইয়া পড়িয়াছে। দেবাদিদেবকে দোষ দিয়া আর কি হইবে? নারায়ণ, নারায়ণ।”

দেবরাজ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “এখন বিষ্ণুই একমাত্র ভরসা। চলুন, বৈকুণ্ঠে যাইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হই।”

“নারায়ণ, নারায়ণ। আমি থাকিতে আপনার বৈকুণ্ঠে যাইবার প্রয়োজন কি? তা ছাড়া আপনার এখন ওপথে বাহির হওয়াটা বিজ্ঞজনোচিত কার্য হইবে না। আমি নারায়ণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আসিয়াছি। আপনি অবিলম্বে দেবগুরু বৃহস্পতিকে বিধান-সভা ডাকিবার নির্দেশ দিন। দেবগুরুকে নারায়ণের পরামর্শ দেওয়া আছে। বিধানসভাতেই আপাততঃ সমাধান মিলিবে। নারায়ণ, নারায়ণ।”

আশ্বস্ত হইয়া দেবরাজ বলিলেন, ‘ঠিক আছে, অদ্য সন্ধ্যায় দেবগুরুকে আগামী পঞ্চমী তিথিতেই বিধানসভা ডাকিবার জন্য অনুরোধ জানাইব।

* * *

পঞ্চমী তিথিতেই বিধানসভা ডাকা হইয়াছে। গোলমালের আশঙ্কা করিয়া বিধানসভার চারিধারে একশত চুয়াল্লিশ ধারা জারি

করা হইয়াছে।

বেলা দ্বিপ্রহরে বিধানসভার কার্যারম্ভ হইল, চারিদিকে তুমুল হট্টগোলের মধ্যে দেবগুরু বৃহস্পতি অধ্যক্ষের আসন গ্রহণ করিলেন।

বিরোধী পক্ষের মুখপাত্র হিসাবে কার্তিক দেবরাজের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতে লাগিলেন, "দেবরাজ ইন্দ্রের অক্ষমতার দরুন পৃথিবীতে খরা, বন্যা এবং বৈদ্যুতিক অচলাবস্থা—এই কারণেই নরগণ দেবপূজা বন্ধ করিয়াছে। বয়োজ্যেষ্ঠ দেবগণ কোটারী করিয়া সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া রাখার দরুন দেবরাজ্যের এই অবস্থা। আমাদের সমস্ত বক্তব্য আমরা আমাদের স্মারকলিপিতে অধ্যক্ষ ব্রহ্মাকে পূর্বাহ্নেই জানাইয়াছি। মুদ্রিত অনুলিপিও সভ্যগণ নিশ্চয়ই পাইয়াছেন। এই সভায় অযথা সময় নষ্ট না করিয়া আমরা দেবরাজের পদত্যাগের দাবী করিয়া পুনরায় নির্বাচনের দিন ধার্য করিতে অধ্যক্ষ মহাশয়কে অনুরোধ জানাইতেছি।"

দেবতাদের বৃহদাংশ সোল্লাসে কার্তিকের বক্তব্যকে সমর্থন জানাইলেন।

দেবগুরু টেবিলের উপর কমণ্ডলু ঠুকিয়া সভ্যগণকে শান্ত হইতে বলিয়া ইন্দ্রকে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

দেবরাজ গম্ভীরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সভ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "অধ্যক্ষ মহাশয় এবং আমার বন্ধুগণ, আপনারা আমার প্রতি যে অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহাতে যদিও আমি ব্যথিত হইয়াছি কিন্তু ইহার সত্যতা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষণীয় নহে। আপনারা গণতন্ত্র চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বন্ধুগণ, আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনারা গণতন্ত্রের উপযোগী কিনা? আজকাল সরকারী বা বেসরকারী কোন বিভাগেই কাজ করানো অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেবগণের লোভের মাত্রাও বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু আয় বাড়াইবার জন্যই সকলে ব্যস্ত—কাজ করিবার জন্য নহে। কাহাকেও কাজ করিতে বলা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে কর্মিগণের

নিজস্ব সংস্থা রক্তচক্ষু করিয়া বাধা প্রদান করেন। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে আমরা সর্বসময় কর্মিদলকেই সমর্থন করি, ইহার ফলে বেশ কিছুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাতেও আমরা বিশেষ বিচলিত হই নাই, কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠানেও এদের ব্যবহার দিন দিন মারমুখী হইয়া পড়িতেছে। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন, আমাদের সে পথও বন্ধ। নূতন করিয়া আইনকানুন না করিলে স্বর্গরাজ্য চালানো সম্ভব নহে।"

"বাজে কথায় ভুলব না—গদি ছাড়, গদি ছাড়" চিৎকারে সভাকক্ষ আলোড়িত হইয়া উঠিল।

"বন্ধুগণ, বন্ধুগণ"—বার দুই চিৎকার করিয়া দেবরাজ আসন গ্রহণ করিলেন।

দেবগুরু বৃহস্পতি অনেক কষ্টে ক্রুদ্ধ সভ্যদের শান্ত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "মহামান্য বিধানসভার সভ্যগণ, আপনারা সকলে পুনরায় নির্বাচন চাহিতেছেন ?"

"নির্বাচন চাই, নির্বাচন চাই"—সমস্বরে অধিকাংশ সদস্য তাহাদের মতামত জানাইয়া দিল।

অধ্যক্ষ বৃহস্পতি কমণ্ডলু ঠুকিতে ঠুকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মহামান্য সদস্যগণ, আপনাদের ইচ্ছা ধ্বনি-ভোটে গৃহীত হইল।"

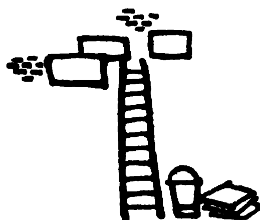
সভাকক্ষ উল্লাসে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

"তবে এখন স্বর্গরাজ্যে বিশৃঙ্খলার দরুন দেবরাষ্ট্রপতি ব্রহ্মাকে দেবরাজ্য শান্ত হইলে নির্বাচনের দিন ধার্য করিতে অনুরোধ জানাইব। আপনারা প্রচারমন্ত্রী নারদের নিকট হইতে যথাসময়ে নির্বাচনের দিন জানিতে পারিবেন। নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান মন্ত্রিসভাই কাজ চালাইয়া যাইবেন। আমি এখন অনির্দিষ্টকালের জন্য বিধানসভা ভঙ্গ করিয়া দিলাম।" বলিয়া

নারদমুনির দিকে চোখ টিপিয়া সভাকক্ষ ত্যাগ করিলেন।

"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক"—সোল্লাসে চিৎকার করিতে করিতে দেবগণ বাহিরে আসিয়া পটকা ফাটাইতে লাগিলেন।

মৃদু হাসিয়া নারদমুনি "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া পৃথিবী পরিক্রমার উদ্দেশ্যে ঢেঁকির উপর আরোহণ করিলেন।



চির উপেক্ষিত



চেম্বারে বসে আছি, মেঘলা আকাশ, দু-এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। প্রচণ্ড গরমের পর ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়াটা বেশ ভাল লাগছিল। বন্ধুবর দ্বিতীয় কাপ চা শেষ করে তৃতীয় কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, "বুঝলি শৈলেন, এই ঠাকুর-চাকরের ঝামেলা নিয়ে আর পারিনে। লোকে বলে চাকরি নেই, আর এদিকে দেখ, ঠাকুর-চাকরের দর্শন পাওয়া ভগবান-দর্শনের চেয়েও কম কঠিন নয়। ওদিকে গিন্নীর মুখচন্দ্রিমাখানা তো বোলতার চাক হয়ে আছে। কি যে করি ছাই!"

"কেন হে, চারদিকে হাজার হাজার ভিখিরী ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটাকে…"

মুখের কথা শেষ করার আগেই বিরক্ত হয়ে বন্ধুবর বলে উঠল, "রাখ্ তোর বক্তিমে। সে চেষ্টা কি আর করিনি, কিন্তু এক শালাও যদি আসে।…আরে, দু'দুবার অ্যাড্ভান্স পর্যন্ত করেছিলাম—বুঝলি, এখন ভিক্ষের ব্যবসাই বেশ চলছে…"

কৌতুক করে বললাম, "তা, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ…"

"থাক্, আর রসিকতা করতে হবে না…দেখ্ দেখি, তোর চাকরটা বাজারে বেরিয়ে না গেলে, বলে দে তো এক কিলো পোনা মাছ যেন নিয়ে আসে।"

"সে কি রে! তোর আর চা লাগবে না?"

"সে পরে হলেও চলবে।" বলে দু'খানা দশ টাকার নোট বের করে দেয়।

হরিকে ডেকে নোট দু'খানা ধরিয়ে দিয়ে বাজারে যেতে বলে দিলাম।

বন্ধুটি আড়চোখে তাকিয়ে বলল, "এই শৈলেন, তোর চাকরের আবার দু'পয়সা এদিক-ওদিক করার অভ্যেস নেই তো?"

"থাকলেই বা কি করবো বল? উপরি আয় সব চাকরিতেই আছে, তোরা তো মোটা টাকার চাকরে—তোদের নেই?"

"আমাদের পেছনে লাগার অভ্যেসটা তোর আজও গেল না—

আমরা আর ওরা! আমরা হলাম গিয়ে ভদ্রলোক, আঃ...”

“হ্যাঁ, বুঝেছি, ওরা হলো ছোটলোক। আচ্ছা, তুই না ‘ডিগ্‌নিটি অফ লেবার’ নিয়ে রচনা লিখে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলি?”

বন্ধুটি রাগতে গিয়ে হেসে ফেলে বলল, “আরে, ওটা তো রচনা লেখার সাবজেক্ট বলে পেয়েছিলাম, প্র্যাক্টিক্যাল ডিমনস্ট্রেশন তো আর দিতে হয়নি।”

“শাবাশ”—এ না হলে খাঁটি ভারতীয়!

বেশ জমে উঠেছিল, এমন সময় পাগলের মত ভুলুয়া দৌড়ে এসে পা-দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে পড়ল, “ডাক্তারবাবু, আমার মনুয়া বোধহয় শেষ হয়ে গেল।”

“অস্থির হোস্ নে, চল্, দেখে আসি কি হয়েছে।” বন্ধুবরকে বসতে বলে যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

... ...

রুগী দেখেই বুঝলাম, শেষ হতে আর বাকী নেই। গম্ভীর মুখ দেখেই ভুলুয়ার বৌ কেঁদে উঠে জিজ্ঞেস করল, “ক্যামন দেখলেন ডাক্তারবাবু? মনুয়া আমার বাঁচবে তো?”

টিবারকুলাস ম্যানিনজাইটিস্—একেবারে শেষ অবস্থা, করার কিছুই নেই। ভুলুয়াকে লক্ষ্য করে বললাম, “একেবারে শেষ সময়ে ডেকে নিয়ে এলি! আগে একবার দেখাতে পারলি না, হতভাগা।”

“কি করে দেখাবো বাবু, আমরা গরীব মানুষ, চাকরের কাজ করি, মাসকাবারে তিরিশ টাকা মাইনে পাই, বউটা ঝি-গিরি করে বলে কোনমতে সংসার চলে ডাক্তারবাবু, ওষুধপত্তরের দাম ক্যামন করে যোগাড় করব? জলপড়া খাইয়েছিলাম, কিন্তু আমার কপালে কিছুই হলো না”—ভুলুয়া হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। দারিদ্র্যের সেই চিরন্তন কাহিনী বুঝতে দেরী হলো না, বললাম, “ভগবানকে ডাক।”

চোখের জল মুছতে মুছতে ভুলুয়ার বৌ বলল, “ভগবান তো

আমাদের কথা শোনে না ডাক্তারবাবু।"

"মনুয়ার মা ঠিক কথাই বলেছে ডাক্তারবাবু, ভগবান আমাদের কথা শোনে না।" একটুখানি থেমে আবার ভুলুয়া বলে উঠল, "মিথ্যে বলব না ডাক্তারবাবু। বাজার থেকে দু-চার পয়সা সরাই—কিন্তু ওটুকু না করলে বৌ-ছেলেটা যে অনেকদিন আগেই না খেতে পেয়ে মারা যেতো···আমি তো কাজে কোনদিন ফাঁকি দিইনি। চাকরের কাজ তো আর আটঘণ্টার ডিউটি নয়, চব্বিশ ঘণ্টার ডিউটি—না আছে ওভারটাইম, না আছে বোনাস। ছুটি-ছাটার কথা না হয় বাদই দিলাম। যতদিন গতর, ততদিন কাজ। যেদিন ঐটুকু হারাবো, সেদিন হয়তো পথে নেবে ভিক্ষে করতে হবে ডাক্তারবাবু···" কান্নায় ভেঙে পড়ে ভুলুয়া। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "ভগবানকে ডাক ভুলুয়া, ভগবানকে ডাক।"

কোনদিকে না তাকিয়ে গাড়ীতে উঠেই তাড়াতাড়ি ড্রাইভারকে চালাতে বলে দিই।

সারা পথটা শুধু নিজেকেই প্রশ্ন করি, "ভুলুয়ারা দু-পয়সা সরালে আমরা বলি চোর, বলি বেইমান, কত কি! আর বিপদে ভগবানকে ডাকতে বলেই আমাদের কর্তব্য শেষ করি। ওরা ভগবানকে হয়তো ডাকবে, ভগবানের দয়া হয়তো ওরা পাবে, হয়তো বা পাবে না—কিন্তু যারা ওদের বানিয়েছে চোর, করেছে রিক্ত-নিঃস্ব, তাদের ক্ষমা করবে কে? জবাব আজও পাইনি।

সত্যমেব জয়তে



শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে সসম্মানে বি ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অপূর্ব বিদেশ হইতেও যখন গোটাকয়েক ডিগ্রী লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিল তখন বিন্দুমাত্র অবাক হই নাই, কারণ অপূর্বর মত প্রতিভাবান ছেলের পক্ষে ইহা কিছুই নয়। কিন্তু অবাক হইলাম তখন, যখন দেখিলাম স্বদেশ ও বিদেশের অনেকগুলি মোটা টাকার চাকরি গ্রহণ না করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

আত্মীয়স্বজন বলিতে বিশেষ কেহই ছিল না। থাকিলেও, কাহারও নিষেধ শুনিত কিনা জানি না। তবু, বন্ধু হিসাবে আমরা যে প্রচুর উপদেশ দিয়াছিলাম, একথা যে-কোন দিব্যি গালিয়া বলিতে পারি। বাঙ্গালীর কৃতী সন্তান যে ব্যবসায়ীর পর্যায়ে নামিয়া আসিবে, ভাবিতেও পারি নাই। যে বন্ধুগর্বে পূর্বে গর্বিত হইতাম, আজ তাহার এই অধঃপতনে তাহাকে বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জাবোধ হইতেছিল।

সেদিন অপূর্ব আমাদের চায়ের আসরে বড় গলায় জানাইয়া দিল—আদর্শ ও সত্যপথেও যে ব্যবসা করা চলে, উনি তাহারই পথ-প্রদর্শক হইবেন। ইহা ছাড়া, কিছু বেকার ছেলেদের কাজের সুযোগও আসিয়া যাইবে। দেশের ও দশের কথা ভাবিয়াই তাহার এই ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থার সৃষ্টি—কালো টাকার বাণ্ডিল বাঁধিবার জন্য নয়।

... ...

কয়েক বছর চলিয়া গিয়াছে। অনেক টানাপোড়েনের মধ্যেও 'অপূর্ব ইণ্ডাষ্ট্রীজ' আজও টিকিয়া আছে, কিন্তু আর বোধহয় টিকানো সম্ভব নয়। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অ্যাকাউন্‌টেণ্ট গোপালবাবু আসিয়া জানাইয়া গেলেন যে, আয়কর বিভাগ ব্যবসায়ের সত্যিকারের রিটার্ন বিশ্বাস না করিয়া দশ হাজার টাকা বেশী কর ধার্য করিয়াছে।

বিরক্ত হইয়া অপূর্ব বলিল, "আপীল করুন না?"

হাত কচলাইতে কচলাইতে গোপালবাবু উত্তর করিলেন, "গতবার আপীল করে কোন ফল হয় নি—শুধু শুধু হয়রানি।"

"তা, কি করতে বলেন ?"

আমতা আমতা কবিয়া গোপালবাবু বলিলেন, "স্যার, আপনি না বুঝলে, কি করি বলুন! সবচেয়ে ভাল জিনিস তৈরি করেও দেখুন আমাদের অবস্থা এই।" পাশের ফ্যাক্টরীর দিকে হাত দেখাইয়া গোপালবাবু আক্ষেপের সঙ্গে বলিলেন, "দেখুন দেখি, পাশের ওরা কেমন থার্ড গ্রেড জিনিস তৈরি করে লালে লাল হয়ে গেল!"

রাগিয়া অপূর্ব বলিল, "আপনি কি আমাকে চোর হতে বলেন ? ব্যবসা আমি করছি আদর্শের জন্য, লোক ঠকানোর জন্য নয়—চাকরি করলে পাঁচ-সাত হাজার টাকা মাইনে পেয়ে যেতাম। আপনার কথামত কালো টাকা করে কি লাভ ? ও টাকায় না কেনা যায় গাড়ী, না করা যায় বাড়ী। ব্যবসাতেও লাগাবার জো নেই—"

"তা বুঝি স্যার, কিন্তু…"

"কিন্তু কি ?"

"এভাবে রুজি ভেঙ্গে গেলে কোম্পানি আর ক'দিন চলবে ? দু-তিন শ' লোক এর উপর নির্ভর করে আছে। এদিকে আবার ইলেকশন আসছে, সব পার্টিকেই কিছু কিছু দিতে হবে। সেও মোটা টাকার ব্যাপার।"

সিগারেটটা অ্যাস্ট্রের উপর দুমড়াইয়া রাখিয়া অপূর্ব বলিয়া উঠিল, "ঠিক আছে। আপনি এক কাজ করুন, যে টাকাটা আমাকে মিথ্যে মিথ্যে দিতে হচ্ছে, সে টাকাটাই 'ব্ল্যাক মানি'তে আয় করুন। কিন্তু সাবধান! দেখবেন, এর বাইরে যেন এক পয়সাও 'ব্ল্যাক মানি' না আসে।"

"যে আজ্ঞে!" মুচকি হাসিয়া গোপালবাবু যাইবার উদ্‌যোগ করিতেই অপূর্ব ডাকিয়া বলিল, "শুনুন গোপালবাবু, আপনি বরং নতুন একটা খাতা খুলে ফেলুন। নাম দিন 'সত্যমেব

জয়তে'।"

বুঝিতে না পারিয়া গোপালবাবু অপূর্বর মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। ম্লান হাসিয়া অপূর্ব কহিল, "বুঝলেন না? যে টাকাটা ব্যবসার জন্য হিসাবের বাইরে খরচা হবে, তার অঙ্কগুলি ঐ খাতায় জমা করে রাখবেন, আর বছরের শেষে ঠিক ঐ পরিমাণ টাকাই 'ব্ল্যাক' করবেন। মনে রাখবেন, এটা আগুন নিয়ে খেলা, এই কালো টাকার এক পয়সাও যেন আমার ঘরে না যায়।"

... ...

দশ বছর চলিয়া গিয়াছে। 'সত্যমেব জয়তে' খাতাখানির কলেবর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আয়কর, বিক্রয়কর বিভাগের দেখাশুনা করার জন্য নূতন অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ করা হইয়াছে। যেসব খরচ আয়কর বিভাগ স্বীকার করেন না, যেমন কোন খদ্দেরকে এন্টারটেইণ্ড করানো অথবা নানা বিভাগে নানা ধরনের কমিশন ইত্যাদি পর পর 'সত্যমেব জয়তে'র খাতায় জমা পড়িয়া এমন জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আজকাল প্রায় সত্যি সত্যিই আয়কর ও বিক্রয়কর বিভাগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছাড়া আর কিছুই দেখানো যায় না।

দিন-কাল পালটাইয়াছে। পালটাইয়াছে আমাদের অপূর্বও। এখন আর সত্যপথের উপর তাহার বিশ্বাস বিন্দুমাত্রও নাই। এদিকে অভিজ্ঞজনের পরামর্শে সরকারী ঋণ লইয়া ব্যবসা প্রচুর ফাঁপাইয়া লইয়াছে। এখন বুঝিতে পারিয়াছে, 'ডান-হাত বাঁ-হাতে'র বন্দোবস্ত না থাকিলে কোন ব্যবসাই চলে না। অনেক জায়গায় যে টাকার উপরেও নানা ধরনের ঘুষ চলিতেছে, তাহাও তাহার অজানা নয়।

অপূর্ব এখন সত্যিকারের 'প্র্যাকৃটিক্যাল ম্যান' হইয়াছে। ব্যবসার অন্ধিসন্ধি ভালভাবেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে, একদিকে যেমন কালো টাকার পাহাড় জমিয়া উঠিয়াছে, অপরদিকে

তেমনি কোম্পানির অবস্থা দিনের পর দিন ক্ষীয়মাণ হইয়া যাইতেছে।

অবশেষে দিল্লীর টনক নড়িয়াছে। কালো টাকার খোঁজে কালো হাত, সাদা হাত একযোগে বাজারে নামিয়াছে।

চিন্তিতভাবে গোপালবাবু অপূর্বকে আসিয়া বলিলেন, "স্যার, এবার কালো টাকার একটা গতি না করলেই তো নয়। রাঘব বোয়ালদের খাঁই মেটাতে মেটাতে তো অস্থির হয়ে গেলাম।"

অপূর্বকেও চিন্তিত মনে হইল। সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছিল। তাহার দিকে তাকাইয়া অপূর্ব বলিয়া উঠিল, "ভাল কথা গোপালবাবু, আপনি একটা কাজ করুন। পাশের বাড়ীটা ভাড়া করে ফেলুন।"

অবাক হইয়া অপূর্বর মুখের দিকে তাকাইয়া গোপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"একটা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক পার্টির অফিস করব—পার্টির নাম দেবো, 'দেশপ্রেমিক পার্টি অফ ইণ্ডিয়া'।"

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে অপূর্ব আবার বলিতে শুরু করিল, "আমি হব সভাপতি আর আপনি হবেন তার সম্পাদক। সংস্থাটাকে রেজিষ্ট্রী করার বাবস্থা করুন। সভাপতির গাড়ী, বাড়ী, ভ্রমণ—মানে, সব রকমের খরচ করার অধিকার থাকবে।"

গোপালবাবু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া অপূর্ব আবার বলিল, "হাঁ করে কি দেখছেন? এসব সংস্থার কোন ইনকাম ট্যাক্স লাগে না। আপনি বরং সময় নষ্ট না করে কতকগুলি সভ্য করে নিন। স্বনামী, বেনামী—যা হোক কিছু। সব ঠিক হয়ে গেলে কালো টাকাগুলি ষ্ট্রীট্ কালেকশন্, ডোনেশন, সভ্যদের চাঁদা বাবদ 'দেশপ্রেমিক পার্টি অফ ইণ্ডিয়া'র অ্যাকাউন্টে জমা দিযে দেবেন।"

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা গোপালবাবুর কাছে জলের মত

সরল হইয়া গেল। খুশি হইয়া বলিলেন, "স্যার, আচ্ছা বুদ্ধি বার করেছেন। আমায় আর বলতে হবে না। দু-দিনের মধ্যেই সব ঠিক করে ফেলছি।"

... ...

পূর্বোক্ত ঘটনার পর আরও দুই বছর কাটিয়া গিয়াছে। 'অপূর্ব ইণ্ডাষ্ট্রীজের' শেষনিঃশ্বাস পড়িবার আগেই তাহার শেষ কার্য সমাধা করিবার দায়িত্ব সরকারের উপর চাপাইয়া দিয়া অপূর্ব রাজনীতির নাট্যমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্বাহ্ণেই 'অপূর্ব ইণ্ডাষ্ট্রীজের' ব্যাঙ্ক লোন, সরকারী লোন প্রভৃতি দেশপ্রেমিক সংস্থার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়াইয়াছে। অপূর্ব এখন অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। প্রায়ই হিল্লী-দিল্লী করিতে হয়। দেশ-বিদেশে ঘোরা-ঘুরিরও অন্ত নাই। ভারতের নানা দিক হইতে দলে দলে শিল্পপতি এবং সরকারী, বেসরকারী, চাকরিজীবীরাও দলে দলে এই সংস্থার শেয়ার কিনিতে, থুড়ি যোগ দিতে, আরম্ভ করিয়াছেন। পরিবর্তে তাহারাও একটা না একটা পোর্টফোলিও অধিকার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রাহা খরচ বাবদ সকলে মোটামুটি খরচাপাতি ভালই পাইতেছেন।

এবার একটা জোর গুজব উঠিয়াছে যে 'দেশপ্রেমিক পার্টি' এবার ইলেক্‌শনে দাঁড়াইয়া অনেকেরই অন্ন মারিবার ব্যবস্থা করিবে। এমনকি পার্লামেণ্ট দখল করাও নাকি অসম্ভব নয়।

সে যাহাই হইক, রাজনীতি বড় গোলমেলে জিনিস। কে উপরে উঠিবে আর কে ডিগবাজি খাইবে, বোঝা কঠিন। সুতরাং ও বিষয়ে কোন মন্তব্য করিব না। তবে হ্যাঁ, বন্ধুগর্বে আবার আমাদের বুক ফুলিয়া উঠিয়াছে। অপূর্ব জিন্দাবাদ!

আমি যদি মন্ত্রী হতাম



বুঝলি রঘু, আমি মন্ত্রী হলে একবার দেখিয়ে দিতাম"—বলেই ভোলানাথ কষে কলকেতে একটা টান মারল।

ফটিক মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠল, "গুরু, মন্ত্রী হবার আগেই যে কলকে ফাটিয়ে দিচ্ছ।"

"বেশ করছি, তোর কি রে শ্লা।"

কলকেটির দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে ভোলানাথকে খোশামোদ করে রঘু বলল, "তা, মন্ত্রী হলে তুমি কোন দপ্তরটা নিতে ভোলাদা ?"

"শিক্ষা।"

"শিক্ষা!" আঁতকিয়ে উঠে ফটিক বলল, "ক'বার দম দিয়েছ গুরু ?"

"কেন, দমের কি দেখলি ? এ হচ্ছে বাবার জিনিস! ভক্তি করে টান, দেখবি পটাপট মগজ খুলে যাবে। নে, ধর"—বলে কলকেটি রঘুর দিকে এগিয়ে দিল।

"দাও, পেসাদ দাও। প্রাণটা আইঢাই করছিল দাদা," বলেই কলকেটিতে একটি মোক্ষম টান মারল।

"এই ভাই রঘু, একেবারে শেষ করে দিস্ নে," বলেই ভোলানাথের দিকে তাকিয়ে ফটিক জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা গুরু, তুমি শিক্ষা দপ্তরটা নিয়ে কি করতে ?"

ভোলানাথ উর্ধ্বনেত্রে হয়তো ভগবৎ চিন্তা করছিল। ধ্যানভঙ্গ হওয়াতে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল, "দেখ ফচ্‌কেমি করিস নে, করার অনেক কিছু আছে..."

"আছে তো বলছ না কেন ? আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, জ্ঞান সঞ্চয় করি।"

"বুঝেছি ফটিক, তোর সেই কোন্ যুগের কলেজী বিদ্যের দেমাক এখনো যায় নি," বলেই হঠাৎ রঘুর দিকে দৃষ্টি পড়াতে বলল, "অ্যাই রঘু—কলকেটা ফট্‌কেকে দিয়ে আর এক ছিলিম সাজ।" তারপর নিজের মনেই বলে উঠল, "শ্লা যেন ফাঁসীর খাওয়া

খাচ্ছে !”

রঘুর হাত হতে কলকেটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে খুশি হয়ে ফটিক বলল, “কি যে বল গুরু, ঐ কেতাবী বিদ্যের গোময় থাকলে আর কি তোমার শিষ্যত্ব নিই ?”

তারপর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, “এবার বলো তো গুরু, তোমার পরিকল্পনাটা কি ?”

“বলছি, বলছি—নেশাটা জমতে দে।”

রঘু এতক্ষণ চুপ করেছিল, সুযোগ পেয়ে ফোড়ন কেটে বলল, “সত্যি, তোরা যেন কি ? ভোলাদা একটু মৌজে বসেছে···”

ধমক দিয়ে ভোলানাথ বলে উঠল, “তুই শ্লা থাম, তোকে যা করতে বললাম তাই কর।” বলেই ফটিককে লক্ষ্য করে বলে উঠল, “বুঝলি ফটকে, আমি মন্ত্রী হলে কলেজগুলির আশী ভাগ বন্ধ করে দিতাম।”

চমকিয়ে উঠে ফটিক বলল, “সে কি, দেশের শিক্ষা···!”

বাধা দিয়ে ভোলানাথ বলে উঠল, “হ্যাঁ, ওগুলিকে শিকেয় তুলে দিতাম। এই ধর গিয়ে—বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ হলে তোরা কি জেনারেল ফিজিসিয়ানকে ডাকিস, না স্পেশালিস্টকে ডাকিস ?”

ফটিক উত্তর করল, “জেনারেল ফিজিসিয়ানকে ডাকি, শুধু শুধু স্পেশালিস্টকে ডাকতে যাবো কোন্ দুঃখে ?”

“তবেই দেখ, এই গাদা গাদা বি এ, এম এ, স্পেশালিস্ট তৈরি করে আমাদের কি লাভ! করবে তো সেই কেরানিগিরি, ক্লাস সেভেন এইটের বিদ্যেই যেখানে যথেষ্ট।”

রঘু ফটিকের সঙ্গে যোগ দিয়ে বলে উঠল, “তা বলে, বি এ, এম এ পাস করে কেরানিগিরি করায় দোষ কোথায় ?”

মুখ ভেংচিয়ে ভোলানাথ বলল, “দোষ! অনেক, অনেক ; মাথায় খানিকটা গব্যঘৃত থাকলে বুঝতে পারতিস শ্লা—আরে বি এ, এম এ পাস করে কেরানিগিরিতে তাদের মন উঠবে কেন? নকল করে

পাস করুক আর যাই করুক, ফ্রাস্ট্রেশনের ছাপটা আছে তো? তাদের বায়নাক্কা কত? বেয়ারার মাইনে দু'শ, তাদের মাইনেও দু'শ—কাজেকর্মে মন দেয় কি করে? কাজের মধ্যে যেটুকু করে, তা হলো গিয়ে লেবার খেপানোর কাজ। প্রতিষ্ঠানগুলিরও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে এসব ওভার কোয়ালিফায়েডদের দিয়ে।"

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ফটিক বলল, "তাহলে গুরু, প্রতিষ্ঠানগুলি বাঁচে কি করে?"

"চলে তোর এই অল্পশিক্ষিত কর্মীদের জন্য। তারা ভাবে, তাদের স্কুল ফাইনালের বিদ্যেতে ঐ দু'শ তিনশ টাকাই যথেষ্ট।" একটু দম নিয়ে আবার বলল, "আরে বাবা, কেরানিগিরির কাজ তো ফর্ম ফিলাপের কাজ—বিদ্যেটা লাগে কোথায় শুনি? যেখানে বিদ্বান লোকের দরকার, সেখানকার জন্যে তো বিশ পারসেণ্ট কলেজ রেখেই দিলাম। সেখানে বরং প্রত্যেক দশটি ছেলের জন্য একজন করে শিক্ষক থাকবেন। তারা সত্যিকারের স্পেশালিস্ট হবে, বুঝলি? শুধুমাত্র ব্রিলিয়্যাণ্ট ছাত্ররাই কলেজে পড়বে।"

রঘু মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, "কিন্তু দাদা, এতে করে তুমি স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ফ্রাস্ট্রেশনের হাত থেকে কি করে বাঁচাবে? এখনকার ব্যবস্থায় অন্ততঃ কয়েকটা বছর স্বপ্ন দেখে বাঁচতো?"

বিজ্ঞের মত ভঙ্গি করে ভোলানাথ বলল, "আরে তা কি আর ভাবি নি? স্কুলের ছেলে-মেয়েদের ফ্রাস্ট্রেশন আসবে না।"

"কি করে জানলে?"

বিরক্ত হয়ে ভোলানাথ বলল, "আরে বাবা, আমি শিক্ষাব্যবস্থাই পালটে দেবো।"

"কি করে ভোলাদা?" নতুন কলকেটি ভোলানাথের হাতে এগিয়ে দিয়ে রঘু জিজ্ঞেস করল।

কলকেটি হাতে নিয়ে ভোলানাথ উদাসভাবে বলে উঠল, "ছাখ, আমি একটা নতুন ধরনের ফরমূলা বার করছি। প্রত্যেক স্কুলে

ছেলেদের হাতের কাজ শিখতে হবে, ওর উপর নম্বর থাকবে। আর হাতের কাজে পাস মার্ক না পেলে পাস করানো হবে না।"

খালি কলকেটি মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে ফটিক প্রশ্ন করল, "হাতের কাজ কি শেখাবে গুরু—পকেটমারা, না কল্‌কে সাজানো?"

"মারব এক রদ্দা"—ধমক দিয়ে ভোলানাথ বলে উঠল, "খুব লেখাপড়া শিখেছিলি শ্লা, কলকে সাজা আর পকেটমারা ছাড়া মাথায় কিছু এল না আর? এই যে রঘু বলছিল, ওদের বাড়ীর জলের কল খারাপ হয়ে গেছে, সারাবার লোক খুঁজে পাচ্ছে না। এই জলের কল মেরামতের কাজ, ইলেক্‌ট্রিকের কাজ, রেডিও ট্রানজিস্টার সারাবার কাজ, জামাকাপড় ইস্তিরীর কাজটাও ছোট নয়। শাকসবজি করা, টাইপিং শেখা, প্রেসের কম্পোজিটারি, টেবিল-চেয়ার তৈরি—বলি কাজ কি আর একটা?"

আর থাকতে না পেরে রঘু জিজ্ঞেস করল, "এসবই যদি শেখে, তবে পড়াশুনা করবে কখন?"

একগাদা ধোঁয়া ছেড়ে ভোলানাথ বলল, "সপ্তাহে দু-চার ঘণ্টা হাতের কাজ শিখলে তবে ভবিষ্যতে করে খেতে পারবে। আর এতে যদি পড়া না হয়, তাদের ঘোড়ার ঘাস কাটার পথ তো আর বন্ধ হচ্ছে না!" বলেই কলকেটি রঘুর হাতে দিয়ে ভোলানাথ বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

ভোলানাথের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে ফটিক ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, "কলেজী বিদ্যের উপর রাগ কত!"

কলকেটি ফটিকের হাত থেকে নিয়ে সায় দিয়ে রঘু বলল, "শ্লা, পাঁচবারেও স্কুলের গণ্ডি পেরুতে পারে নি কিনা—তাই।"

নাটক নিয়ে নাটক



পাশাপাশি হুটো দল। হু'দলের ঝগড়ায় পাড়ার লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। অনেক মারামারি কামড়াকামড়ির পর পাড়ার লোকের মধ্যস্থতায় বা চাপে পড়ে হু'দলের মধ্যে কিছুটা শান্তির ভাব দেখা যাচ্ছে। এক দলের লোক আর-এক দলের লোকেদের দেখলে এখন আর মারমুখো হয়ে ওঠে না; বরং দাঁত বার করে পরিচয়ের হাসি দেখায়।

পাড়ার লোকেরা পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিয়েছেন, এর পর কোন রকম কোঁদল করলে ভবিষ্যতে তারা আর কোনও দলকেই বারোয়ারী পুজোপার্বণে চাঁদা দেবেন না; কারণ দলের ওপর থেকে ক্রমেই তাদের আস্থা চলে যাচ্ছে। তারা সব চাঁদা তুলে কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির হাতে দেবেন, তিনি তাঁর খুশিমত পুজো-পার্বণের জন্যে খরচাপাতি করবেন।

ছেলের দল প্রমাদ গোনে। এভাবে পাড়ার লোক বিগড়ে গেলে তো ক্লাব চালানোই দায় হয়ে যাবে! দিন দিন খরচা বেড়েই চলেছে, এখন পাড়ার লোকেদের চটিয়ে আখের নষ্ট করতে কেউই রাজী নয়। সুতরাং, বোমা-পিস্তল, পাইপগান আপাততঃ মাটির নীচে চাপা পড়েছে। এখন যে হু'দলে হরিহর আত্মা, তা প্রমাণ করার জন্যে একটা 'মিলন উৎসব' করার প্রয়োজন; সুতরাং প্রবীর তার বিপক্ষ দলনেতা জয়ন্তকে নিয়ে একযোগে মিটিং ডেকেছে। এজেণ্ডা—হু'দলের মিলন উপলক্ষ্যে নাট্যাভিনয়।

প্রবীর তার সাগরেদ অসীম, কানাই ও দীপেনকে ডেকে এনেছে। অপর পক্ষে জয়ন্ত, অরুণ, গৌরাঙ্গ ও পরেশ এসে হাজির হয়েছে। যথারীতি হু'দলের কুশল বিনিময়ের পর চা-পর্ব শেষ করে কাজের কথায় এসেই গণ্ডগোল বেঁধে গেছে।

থিয়েটারে হু'পক্ষের সমর্থন আছে, কিন্তু মুশকিল হলো নাটক নির্বাচনে। প্রবীরের দল থেকে অসীম বলে ওঠে—দেখুন, অভিনয় যদি করতে হয় তো হিস্টরিক্যাল। আমরা বেশ কিছুদিন ছোরাছুরি

নিয়ে কাজ করেছি, লাইনটা প্রায় জানা, বেশী রিহার্সালের দরকার হবে না।

সজোরে মাথা নেড়ে জয়ন্তর দল থেকে গৌরাঙ্গ বলে ওঠে —কি বলছেন দাদা? মিলে যখন গেছি, তখন আর ঐ ছোরা-ছুরি তরোয়াল-টরোয়াল কেন? আবার মেজাজ চনমন করে উঠতে কতক্ষণ? তার চেয়ে একটা সামাজিক নাটক করুন, অন্ততঃ তাতে আমাদের অসামাজিক দুর্নামটা ঘুচবে।

প্রায় বাহান্নখানা নাটক বেছেও কেউ থৈ পেল না। দু' নেতা গালে হাত দিয়ে ভাবতে থাকেন—এর সমাধান কোথায়? এমন সময় হঠাৎ দীপেন পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় বলে ওঠে—আইচ্ছা, আমরা একখান নাটক লেইখ্যা ফেলাই না? আমাগোর সকলের যাতে ভালো ভালো পার্ট থাকে—এমন কইর‍্যা।

পরেশ ব্যঙ্গ করে কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে জয়ন্ত বলে ওঠে—কথাটা কিন্তু মন্দ বলে নি, একবার চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়?

মিলনের একটা সূত্র পেয়ে প্রবীর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, অন্ততঃ কিছুটা সময় পাওয়া যাবে। জয়ন্ত সায় দিয়ে বলে ওঠে —ঠিক, ঠিক, একটা অরিজিন্যাল জিনিসও হবে।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অতি উৎসাহী অরুণ বলে ওঠে— আচ্ছা, এই নাটকের মারফত আমরা বর্তমান নাট্য সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ধরিয়ে দিয়ে এই শিল্পের অনেক উন্নতি করতে পারি।

কানাই অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল, আর থাকতে না পেরে গালের মশাটাকে সজোরে একটা থাপ্পড় মেরে বলে ওঠে—রাখুন মশাই, পশ্চিম বাংলার নাটক ভারতবর্ষে সবার ওপরে। যদি পথ দেখাতে চান তো বাংলা সিনেমাকে নিয়ে পড়ুন; সিনেমা শিল্পে এখন অক্সিজেন চলছে। দেখুন, যদি গঙ্গাযাত্রার আগে ঠেকাতে পারেন!

সবাই একমত হয়ে বাংলা সিনেমাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর প্রস্তাব সোল্লাসে পাস করে ফেলে।

অসীমের বি এ পরীক্ষায় বাংলায় অনার্স ছিল, যদিও টেস্টে 'এলাও' হতে পারে নি, তবুও সে ছাড়া অন্য কোন যোগ্যতর লোক পাওয়া গেল না। অসীম সানন্দে নাটক লেখার দায়িত্ব নিয়ে বলে—এবার আমাকে পয়েন্ট অফ রেফারেনস্ দিন। মানে, কোন্ বিষয়ের ওপর ফোকাস করব!

জয়ন্ত একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলে—দেখুন, প্রথমে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে বাংলা সিনেমার পতনের কারণ কি?

সমস্বরে সবাই জয়ন্তকে সমর্থন করে। জয়ন্ত বলতে শুরু করে—নাম্বার ওয়ান, বাংলা সিনেমার গল্প অত্যন্ত জোলো। নাম্বার টু, এতে কোনও থ্রীল নেই, নতুন ইম্যাজিনেশান্ নেই, ক্রাইম ফিক্‌শান নেই। নাম্বার থ্রী, নাচ-গান প্রভৃতি গা গরম করা জিনিসের একান্ত অভাব।

দীপেন মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে—ঠিক কইছেন জয়ন্ত-বাবু, এক্কেবারে কিছু নাই। দেখেন দেখি, হিন্দী সিনেমার নায়ক ক্যামন সোন্দর! বিদেশ থিক্যা পাস কইব্যা আইস্যাই অ্যারোড্রাম থিক্যা নাচ-গান করতে আরম্ভ কইর‍্যা দেয়। গান একটা পবিত্র জিনিস! হাটে মাঠে ঘাটে, আপিস-কাছারিতে গান, খালি গান —আহা!

ধমক দিয়ে পরেশ বলে—থামুন মশাই, গান আর গান! ওদের অ্যাক্‌শান দেখেছেন—ঠিক আজকালকার ইংরেজী বই-গুলির মত। নায়ক এগোচ্ছে হাতে পিস্তল, ওদিক থেকে ভিলেন এগোচ্ছে হাতে পিস্তল। মাঝখানে নায়িকা, দু'চোখে জল। নায়িকার দু'পাশে দুটো মেশিনগান পড়ে আছে। নায়ক আর ভিলেন পিস্তল ফেলে দিয়ে দু'জনে দুটো মেশিনগান তুলে নেয় —কাট্। সাঁই সাঁই করে দু'জনেই গুলি ছুঁড়ছে। চেয়ার টেবিল গ্লাস ঝাড়-লণ্ঠন—সব ঝনঝন করে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু নায়ক বা

ভিলেন কারও গায়ে গুলি লাগে না। নায়িকার মুখে গান—কাট্। নায়ক আর ভিলেন খুব কাছাকাছি দুজনেই, হঠাৎ মেশিন-গান ফেলে দিয়ে দু'জন দু'জনের ওপর ছোরা হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নায়িকা একবার এদিকে এগিয়ে আসে, একবার ওদিকে পিছিয়ে যায়, তার গায়ের বসন সরে যায়—কাট্।

—এই জায়গাটা একটু বেশী কইর‍্যা কাটেন, বক্স-অপিস ফাঁইপ্যা উঠবো। দীপেন সোল্লাসে বলে ওঠে।

ভ্রূক্ষেপ না করে পরেশ বলে চলে—তারপর ছোরা ফেলে দিয়ে শুরু হলো ঘুষোঘুষি, নায়িকার গান—কাট্। নায়ককে জানালার ভেতর দিয়ে ঠেলে বাইরে ফেলে দিল ভিলেন—

আঁতকে উঠে দীপেন বলে—করেন কি, করেন কি পরেশ বাবু, নায়করে ফেলাইবেন না, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের সহায় ছিল শ্রীকৃষ্ণ, আর সিনেমায় নায়কের সহায় আছে ডিরেক্টর।

পরেশ ধমকে বলে—আপনি বড্ড ডিস্টার্ব করেন। কোথায় আমি অসীমবাবুকে হেল্প করছি, খালি ব্যাগড়া! বলি, আমি কি শেষ করেছি?

—আর কি বাকী রাখছেন?

অসীম দীপেনকে ধমক দিয়ে বলে—তুমি একটু থামবে দীপেন? আমি পয়েন্টগুলো নোট করে নিচ্ছি। তারপর পরেশের দিকে তাকিয়ে বলে—আপনি বলে যান পরেশবাবু—

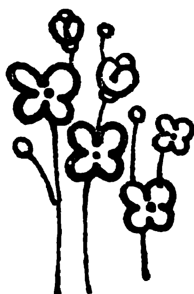
দীপেন মুখ গোমড়া করে বসে থাকে। পরেশ নবোদ্যমে বলতে থাকে—হ্যাঁ, নায়ক জানালা ধরে ঝুলছে, ভিলেন এগিয়ে যাচ্ছে নায়িকার দিকে। হঠাৎ নায়ক ভিলেনকে পেছন থেকে হ্যাঁচকা টানে বাইরে টেনে নিয়ে আসে। নায়িকা শাড়ির আঁচল জানালা দিয়ে নামিয়ে দেয়। নায়ক এক হাতে শাড়ির আঁচল আর অন্য হাতে ভিলেনকে ঘুষি মেরে পাহাড়ের ওপরের বাংলো থেকে মাটিতে ফেলে দেয়—কাট্। নায়ক জানালা দিয়ে ভেতরে ঢোকে—কিন্তু নায়িকা কোথায়? চিৎকার করে ওঠে নায়ক। আলমারির

আড়াল থেকে নায়িকা কঁকিয়ে ওঠে—'আলোটা নিভিয়ে শাড়িটা এদিকে ছুঁড়ে দাও'—কাট।

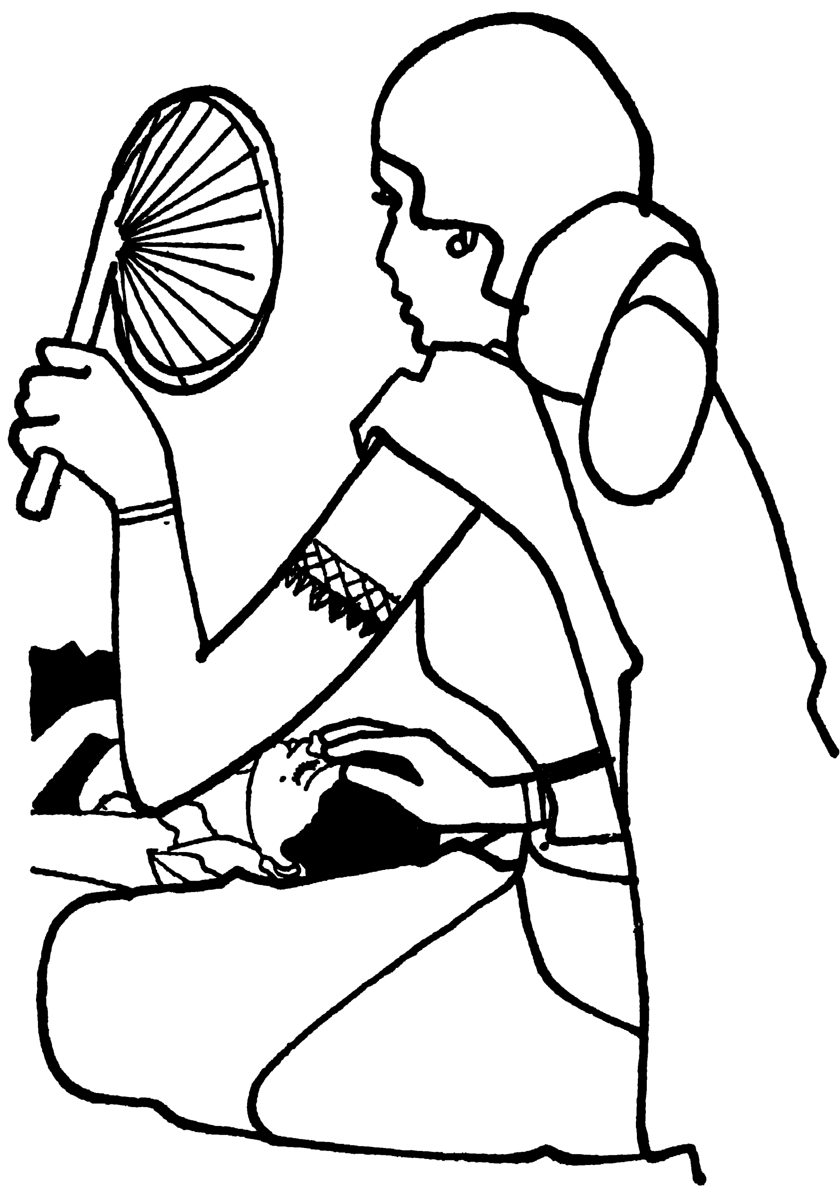
সবাই হাততালি দিয়ে ওঠে। অসীম বলে ওঠে—ঠিক আছে, আমি দিন দশেকের মধ্যে নাটক লিখে ফেলছি। আপনারা আনুষঙ্গিক কাজগুলো গুছিয়ে ফেলুন।

সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হলো, নাটকের পরিচালনার ভার থাকবে পরেশের ওপর। চরিত্রানুযায়ী পার্ট বণ্টন করবে দীপেন। সুর-সংযোজনা করবে অরুণ। সম্পাদনায় গৌরাঙ্গ, আর যদি কোথাও গোলমাল দেখা দেয়, তা হলে দুই দলনেতা টসের সাহায্যে মীমাংসা করবেন।

এর পর তিন মাস হয়ে গেছে, নাটক এখনও মঞ্চস্থ হয় নি। পার্ট বণ্টনের সমস্যা দুই দলনেতাও মেটাতে পারেন নি। দু'দল এখন চাব দ'লে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশেব সিনেমা শিল্পকে বাঁচানোর শুভেচ্ছার অকালমরণ হয়েছে। দুই নেতা—প্রবীর আর জয়ন্ত কোথায় যে সটকেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাদের কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না!



ডিরেংনামটা কি ?



আট বছরের ছেলে সুজনকে পাওয়া যাচ্ছে না। স্কুলে ধর্মঘট চলছে, ছেলেরা মিছিল করে বেরিয়ে গেছে। বেলা গড়িয়ে এল। সুজনের বন্ধুরা কেউ কেউ ফিরে এসেছে। ট্রাম-বাস বন্ধ, থমথমে আবহাওয়া।

বোমার আওয়াজ আর কাঁদুনে গ্যাসকে উপেক্ষা করে পাগলের মত বেরিয়ে পড়ে সুজনের বিধবা মা। সুজন তার সবেধন নীলমণি, একমাত্র সন্তান—তার ভবিষ্যতের একমাত্র আশা। চোখ ঝাপ্সা হয়ে আসে, ভগবান কি তার শেষ সম্বলটুকুও কেড়ে নেবেন! পাগলের মত সারাটা দিন খুঁজে বেড়ায়, তার পর আবার ফিরে আসে বাড়ী—ক্ষীণ আশা, হয়তো বা ফিরে এসেছে সুজন।......

সন্ধ্যার অন্ধকারে সুজন ফিরে আসে। কড়া নাড়ার প্রয়োজন হয় না, মা দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। ক্ষোভে, দুঃখে উন্মাদ হয়ে ওঠে সুজনের মা, কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আসে বাড়ীর ভিতরে। তারপর শুরু করে এলোপাতাড়ি মার, "হতচ্ছাড়া ছেলে, কেন গিয়েছিলি মিছিলে ?"

সুজন কাঁদতে কাঁদতে বলে, "সবাই গিয়েছে, আমি না গেলে আমায় মার লাগাতো।" আর বেশী বলতে পারে না সুজন, ঢলে পড়ে সিঁড়ির উপরে।

ততক্ষণে মা'র হুঁশ ফিরে আসে, ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখে, তার পা দিয়ে রক্ত ঝরছে।

চিৎকার করে ওঠে মা, "খোকা, কি সর্বনাশ করেছিস, তোর পা দিয়ে যে রক্ত পড়ছে।" গায়ে হাত দিয়ে ভেঙ্গে পড়ে মা, "ওরে তোর গা যে পুড়ে যাচ্ছে।"

বিছানায় শুইয়ে দেয় সুজনকে। ডাক্তার আসে, নতুন করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধে, ইন্‌জেক্‌শনের পর ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে চলে ডাক্তার। পা-টা কেটে বাদ দিতে হবে কিনা কে জানে! বেহুঁশ সুজন জ্বরের ঘোরে বকে চলে, "আমায় কেন মারছ মা, আমি তো পড়াশুনায় ফাঁকি দিই না ? তুমি কি বলো নি মা, সবাই-এর সঙ্গে

মিলেমিশে থাকতে, মাষ্টারমশাইদের কথা শুনতে? আমি তো তাঁদের কথা শুনেছিলাম মা, আমার কি দোষ?”

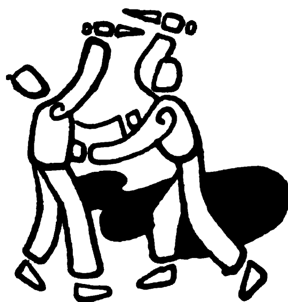
চোখের জল বাঁধ মানে না, ছেলের মাথায় হাওয়া করতে করতে মা বলে ওঠে, “তোর কোন্ দোষ নেই খোকা, দোষ আমার এই পোড়া কপালের।”

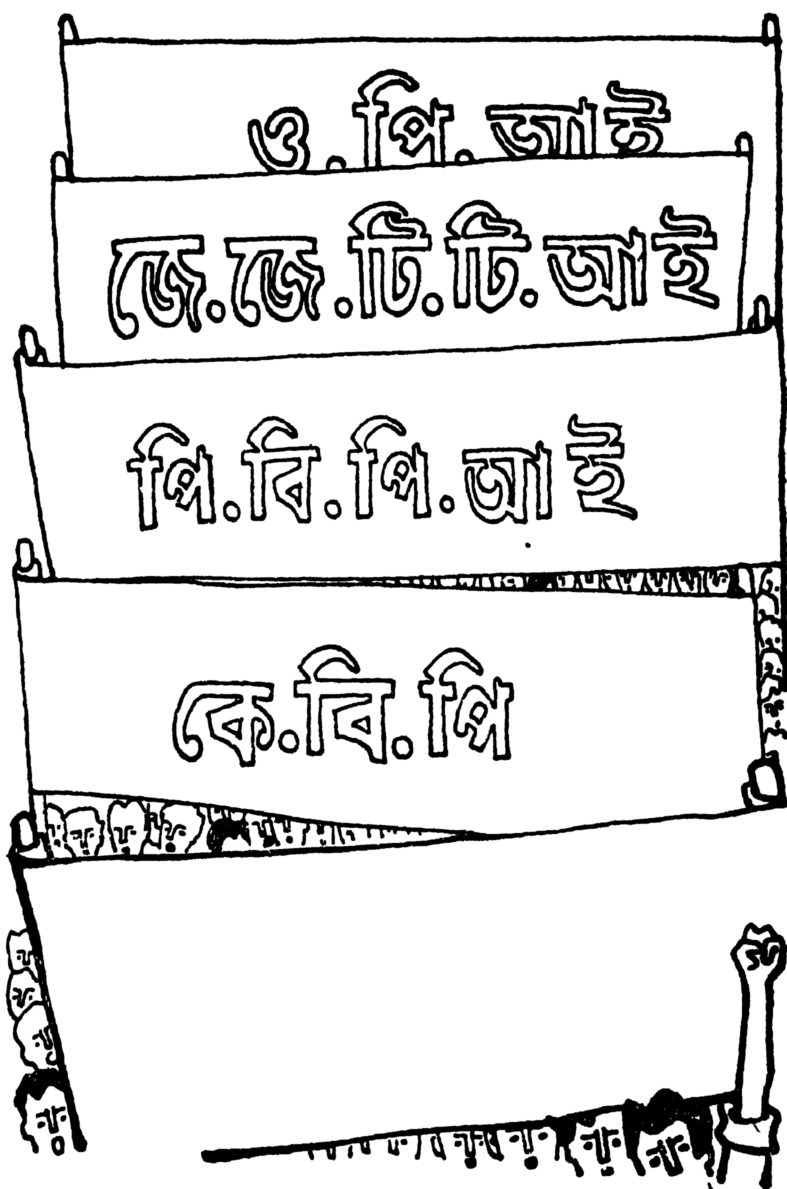
স্বামী মারা যাওয়ার পর অনেক কষ্টে মানুষ করেছে সুজনকে। সবদিন পেট পুরে খেতে দিতেও পারে নি, তবু সকলের মন জয় করেছিল আট বছরের ছেলে সুজন। পড়াশুনায় যেমন ছিল ক্লাসের সেরা, তেমনি খেলাধূলায়ও পিছিয়ে ছিল না।

মাথা খুঁড়ে কেঁদে ওঠে দুঃখিনী মা।

জ্বরের ঘোরে সুজন কি যেন খুঁজে বেড়ায়, মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে মা জিজ্ঞেস করে, “কি রে খোকা, কিছু বলবি?”

মা'র দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে সুজন বলে, “মা, ভিয়েৎনামটা কি?”




ও.পি.আই
জে.জে.টি.টি.আই
পি.বি.পি.আই
কে.বি.পি

শ্যামদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া ক্লাব-ঘরে উপস্থিত হইল।

রঞ্জু, মানিক, দেবু, সঞ্জয়, তপেন সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব্যাপার, শ্যামদা ?"

"দাঁড়া, আগে একটা সিগারেট ছাড় দেখি ?"

চারমিনারের প্যাকেটটা আগাইয়া দিয়া তপেন কহিল, "আরে বাবা, কি হয়েছে বলবে তো ?"

সিগারেটটা ধরাইয়া একগাল ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে শ্যামদা বলিতে শুরু করিল, "আরে বাবা, বাপের জন্মে কোনোদিন শুনেছিস, সব ক'টা রাজনৈতিক পার্টি একসঙ্গে কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল মিটিং করেছে ?"

"কি ব্যাপার, কবে, কোথায় ?" সকলে জাঁকাইয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল।

"তবে আর বলছি কি ? ও, পি, আই ; জে, জে, টি, টি, আই ; পি, বি, পি, আই ; কে, বি, পি—আরও যে কত কি সব বিদ্‌ঘুটে নাম, সব মনেও নেই। তবে মিটিংটা গড়ের মাঠেই হচ্ছে, অত্যন্ত গোপনে। বাইরের কাক-পক্ষীরও প্রবেশের অধিকার নেই, সংবাদপত্রের লোকদের তো নয়ই। তবে কাগজের মালিকপক্ষের দু'একজন ছিল কিনা হলপ করে বলতে পারব না···"

মাঝপথেই সঞ্জয় বলিয়া উঠিল, "তা, তুমি গেলে কি করে শ্যামদা ?"

শ্যামদা চোখ লাল করিয়া তাকাইতেই তপেন বলিয়া উঠিল, "থাম তো সঞ্জয়, খালি কথার মাঝখানে ব্যাগড়া দেওয়া ! তুমি বলে যাও শ্যামদা।"

"ঠিক আছে, এবারকার মত মাপ করে দিলাম।" শ্যামদা বলিতে শুরু করিল, "আমি গিয়েই শুনি সভাপতি ভাষণ দিচ্ছেন : 'বন্ধুগণ, আমাদের রাজনীতি করাই পেশা। কিন্তু আপনারা জানেন, আমরা বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিলেও বস্তুতঃ এক প্রফেশনের লোক। আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে ভুল বোঝাবুঝি

হয় বলিয়াই আজ এই মহতী সভা আহ্বান করা হইয়াছে। আপনারা অবগত আছেন, আমরা নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বেকার-নাশন এবং সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি নীতি দলমত নির্বিশেষে গ্রহণ করিয়াছি। কার্যক্ষেত্রে আমাদের মত বা পথ যাহাই হউক না কেন, আমরা যেন ভুলেও আমাদের কমন প্রোগ্রামগুলিকে সত্য ভাবিয়া কাজে পরিণত করিবার চেষ্টা না করি।'

'হিয়ার! হিয়ার!'

'আমরা জানি, আমাদের সকল পার্টির সভ্যবৃন্দ ও ক্যাডারগণ মিলিয়া মিশিয়া নাইট স্কুল করিলে ভারতবর্ষ হইতে নিরক্ষরতা কয়েকমাসের মধ্যেই দূর করিতে পারি। কিন্তু সাবধান, ওপথে এগুবেন না। জনগণ শিক্ষিত হইলে আমাদের ভাঁওতা ধরিয়া ফেলিবে, আমাদের আর মোড়লি করা চলিবে না। আপনারা বলিতে পারেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে পাব্লিক আগাইয়া আসিতে পারে। তাহাদের হাতেও প্রচুর সময়। সাধারণতঃ সাত-আট ঘণ্টার বেশী কেউ কাজ করে না। বাড়তি সময় হইতে ঘণ্টাখানেক জনশিক্ষার জন্য তাহারাও ব্যয় করিতে পারে। হ্যাঁ, এই প্রশ্নের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি থাকিলেও আমি আপনাদের ভরসা দিয়া বলিতে পারি, পাব্লিক এ পথে কখনও অগ্রসর হইবে না। তাহারা বড় জোর সরকার এবং রাজনৈতিক সংস্থাগুলিকে দোষারোপ করিয়াই নিজ নিজ কর্তব্য সমাধান করিবে। পরনিন্দা, পরচর্চা, পাণ্ডিত্য জাহির প্রভৃতির জন্য অমূল্য সময় এখানে ব্যয় করিবে না। আপনারা বরঞ্চ একদিকে যুব-সমাজকে সেল্‌ফ এমপ্লয়মেণ্টের দিকে উৎসাহ দিন, অপরদিকে শিল্পের প্রতি ঘৃণার মনোভাবের সৃষ্টি করুন। নিজ নিজ ছেলেদের ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত করুন, তাহারাই জাতির ভবিষ্যৎ। অপরদিকে প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা চালাইয়া যাইবার জন্য সরকারকে বাধ্য করুন। ভাষার রেষারেষি বাড়াইয়া যান। হঠাৎ এমন কোন কাজ করিবেন না, যাহাতে আন্দোলনের উপলক্ষ্য বন্ধ হইয়া যায়। মনে রাখিবেন,

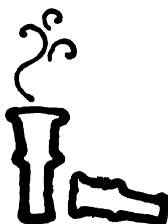
আমাদের একমাত্র হাতিয়ার আন্দোলন। জন-অশান্তি প্রভৃতিই আমাদের প্রফেশনের একমাত্র মূলধন। ভগবান আপনাদের দীর্ঘজীবী করুন। নিখিল ভারত রাজনৈতিক সংস্থা জিন্দাবাদ।'

হাততালিতে সভামণ্ডপ ফেটে পড়বার উপক্রম হলো। ডামা-ডোলের মাঝখানে সবার অলক্ষ্যে আমিও পালিয়ে এলাম। শ্যামদা রঞ্জুর জন্য আনা অরেঞ্জ স্কোয়াসের বোতলটা একটানে সাবাড় করিয়া দিল।

হতাশ হইয়া তপেন কহিল, "সব বুঝলাম, কিন্তু ও, পি, আই; জে, জে, টি, টি, আই; পি, বি, পি, আই; কে, বি, পি—এই পার্টিগুলি কি?"

"দে, আর একটা সিগারেট ছাড়"—বলিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়া আর গোটা তিনেক পকেটে পাচার করিতে করিতে শ্যামদা কহিল, "সোজা কথাগুলি বুঝলি না—ও, পি, আই, হলো গিয়ে অপরচ্যুনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া। জে, জে, টি, টি, আই, হলো যখন যেমন তখন তেমন পার্টি অফ ইণ্ডিয়া। পি, বি, পি, আই, হলো পারশোনাল বেনিফিট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া। কে, বি, পি, হলো ক্যারিয়ার বিল্ট আপ্ পার্টি"—বলিয়াই শ্যামদা ঝড়ের বেগে ক্লাব হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিরক্ত হইয়া দেবু কহিল, "শালা নির্ঘাত টেনে এসেছে।"



বেচা-কেনা



শ্যালিকার বিবাহ। পাটনা যাইতে হইবে। শ্বশুর মহাশয় বার বার লিখিয়াছেন—যেন বিবাহের দুই-চারিদিন আগেই আমরা পৌঁছাইয়া যাই। বিদেশ বিভুঁই, আমরা ছাড়া দেখাশুনা করিবার আর কেহই নাই। ইহাই তাঁহার শেষ কাজ। গৃহিণীর কাছে শুনিলাম—সর্বস্বান্ত হইবার মত কাজও বটে। বরপণ এবং বরাভরণ সহকারে বরপক্ষের দাবী-দাওয়া মিটাইয়া যাহা থাকিবে, তাহাতে কন্যার বিবাহের পর তাঁহাদের পথে বসিতে না হইলেও স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে যে থাকিতে পারিবেন না, সে বিষয়ে আমিও নিঃসন্দেহ।

আপিসের কেরানী হইলে ছুটি পাইতে অসুবিধা হইত না; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে 'অফিসার র‍্যাঙ্ক' হইবার দরুন কর্তৃপক্ষের মন যোগাইয়া চলিতে হয়। সুতরাং অনেক 'কাঠখড়' পোড়াইয়া মাত্র সাতদিনের ছুটি পাওয়া গেল। রেলের টিকিটের জন্য অপেক্ষা না করিয়া শেষরাত্রে অ্যামবাসাডার গাড়ী সম্বল করিয়া বাহির হইবার সঙ্কল্প করিলাম। গৃহিণী গজগজ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, এতটা পথ আর বাহাদুরী করিয়া নিজে চালাইয়া যাইবার দরকার নাই, বরং অফিসের ড্রাইভারকে কিছু বকশিশের লোভ দেখাইয়া সঙ্গে লইয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে।

গৃহিণীর কথা একমাত্র ব্যাচিলার ছাড়া কে কবে অমান্য করিতে পারিয়াছে আমার জানা নাই, সুতরাং 'তথাস্তু' বলা ছাড়া আমার আর করিবার কিছুই ছিল না। যথা সময়ে রাত চারিটা নাগাদ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া রওনা হইয়া পড়িয়াছি। বর্ধমানের কাছে প্রাতরাশ এবং আসানসোলে মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করিয়া আবার চলিতে শুরু করিলাম।

সারাপথ গৃহিণী অফিসের বাপান্ত করিয়াছেন। অফিসের কর্তৃপক্ষ কেবল রক্তশোষণ করিয়াই থাকে। আর সাতটা দিন বেশী ছুটি দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত? মাঝে মাঝে আমাকেও কটাক্ষ করিতে ছাড়িতেছেন না। 'আমি নাকি অফিসের

দণ্ডমুণ্ডের মালিক। আমার প্রতাপে নাকি বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইয়া থাকে! শুধু নিজের মুণ্ডটির উপরেই অধিকার নাই! অমন চাকরি না করিয়া ঘোড়ার ঘাস কাটাও নাকি অনেক লাভজনক।' গৃহিণীকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছি—'ব্যবসা-বুদ্ধি আমার কোনদিনই বিশেষ নাই। তবে উনি যখন বলিতেছেন, কলিকাতা ফিরিয়া যাইয়া না হয় ঘোড়ার ঘাস কাটিয়াই দেখিব, তবু যদি বেশী লাভ করিয়া গৃহিণীর মুখে হাসি ফুটাইতে পারি!' আশ্বাসের রসাস্বাদন করিতে না পারিয়া গৃহিণী 'তেলে-বেগুনে' জ্বলিয়া উঠিয়া বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আমিও মনের আনন্দে চুরুট ফুঁকিয়া চলিলাম।

সূর্য পড়িয়া গিয়াছে। রায়গঞ্জ ছাড়াইয়া তোপচাঁচীর মাঝামাঝি আসিয়া পড়িয়াছি। গাড়ী হঠাৎ থামিয়া গেল। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার—গাড়ী থামালে কেন?

—টায়ার ফেঁসে গেছে।

গৃহিণী আঁতকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হবে?

—কি আর হবে? ষ্টাপ্‌নি থেকে আর-একটা চাকা লাগিয়ে নেবে, বড়জোর দশ মিনিট।

গাড়ী হইতে নামিয়া মুক্তবায়ুতে দাঁড়াইয়া চুরুটে মাত্র একটা সুখটান দিয়াছি, এমন সময় ড্রাইভার আসিয়া বলিল—বাবু, ষ্টাপ্‌নির চাকাতে হাওয়া নেই।

গৃহিণী প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিলেন—ষ্টাপ্‌নিটা দেখে নিয়ে বেরুতে পার নি? যেমনি বাবু, তেমনি ড্রাইভার।

বিরক্ত হইয়া আমিও কহিলাম—দূরের পথে যাচ্ছ, একটু দেখেশুনে বেরুবে তো? দেখ দেখি, এখন কি হবে?

—কিছু ভাববেন না বাবু, আমি বাসে করে তোপচাঁচী থেকে চাকায় হাওয়া ভরে নিয়ে আসছি।

—কতক্ষণ লাগবে?

—এই আর কতক্ষণ, বড় জোর আসতে যেতে ঘণ্টাখানেক।

দূরে একটা বাস আসিতে দেখা গেল। বলিলাম, তা হলে আর সময় নষ্ট করো না, ঐ বাসটা যাতে ধরতে পারো তার চেষ্টা করো।

ড্রাইভার চাকাটি লইয়া তোতচাঁচীর বাসে উঠিয়া পড়িল। গৃহিণী রাগিয়া গুম্ হইয়া পথের পাশেই একটা গাছে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—যাক্ আর কি হবে? তোপচাঁচীর লেক-বাংলো তো বুক করাই আছে। না হয় একঘণ্টা পরে পৌছোব।

গৃহিণী ক্রুদ্ধদৃষ্টি ফেলিয়া মুখ ঘুরাইয়া লইলেন।

গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোডের পাশেই মেঠো পথ। পশ্চিম দিক ক্রমশই রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে। কলিকাতার লোক—জঙ্গল দেখা ভাগ্যে হয় না। যদিও কর্পোরেশান এবং সি, এম, ডি, এ-র কল্যাণে পথে-ঘাটে প্রায়ই আবর্জনার জঙ্গল এবং খানা-ডোবা দেখিতে পাই, তবুও প্রাকৃতিক জঙ্গল এবং মেঠোপথের একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিলাম। ছেলেবেলায় গ্রামে মানুষ হইয়াছিলাম, হয়তো তাহার জন্যই এই আকর্ষণ। গৃহিণীকে বলিলাম—চলো না, একটু এগিয়ে হেঁটে দেখি। গাড়ী তো লক্ করাই আছে।

গৃহিণী এবার যেন একটু সদয় হইলেন। হয়তো দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পা ব্যথা হইয়া গিয়াছিল; বলিলেন, বেশী দূরে গিয়ে কাজ নেই, সামনের গাছটা পর্যন্ত চলো। গাড়ীটা চোখে চোখে রাখা যাবে।

খুশি মনে হাঁটিতে শুরু করিলাম। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই গৃহিণীর ডাকে ফিরিয়া তাকাইলাম।

—ওগো দেখছো, একটা ভাঙ্গা মূর্তির মত নয়?

তাকাইয়া দেখি, একটা অতি পুরাতন ভাঙ্গা পাথরে খোদাই করা মূর্তি। শিল্পীর কাজ খুব পাকা হাতের মনে হইল না। পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা পরিষ্কার করা, দেখে মনে হইল লোকজনের যাতায়াত আছে। কতকগুলি গ্রাম্য লোক যাইতেছিল,

ঔৎসুক্য বশে জিজ্ঞাসা করিলাম—এই ভাঙ্গা মূর্তিটা কার?

কেহই বলিতে পারিল না। তাহারা ভিন্ন গ্রামের লোক, হাটে আসিয়াছিল। তবে জবানীতে জানিতে পারিলাম যে, এখানে মাঝে মাঝে গ্রামের মেয়েরা ফুল দিয়ে যায় এবং বিবাহের আগে প্রণাম করিতে আসে। একটি বৃদ্ধলোক এইদিকেই আসিতেছিল। আমাদের দেখিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তাহাকে এই মূর্তিটির কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে শুরু করিল: আজ্ঞে আমারও প্রায় চার কুড়ি বছর বয়েস হলো। আমি প্রায় সারাটা জীবন বাংলা-দেশে কাটাইছি বাবু। আমিও সঠিক ব্যাপার জানি না। তবে আমার ঠাকুর্দা তেনার ঠাকুর্দার কাছে যা শুনেছিল—তাই বলছি। এখানে ঐ যে জঙ্গল দেখছেন বাবু, ওখানে একটা খুব বড় গাঁ ছিল। গাঁয়ের নাম ছিল 'কাজুরী'। গাঁয়ের লোকেরা খুব গান-বাজনা ভালবাসতো।

ভাঙ্গা মূর্তিটিকে দেখাইয়া সে বলিল, ঐ গাঁয়েই থাকতো এই দয়ারাম তেওয়ারী।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর?

—বলছি মাঈজী। বলিয়া বৃদ্ধ দম লইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল: এই দয়ারাম ছিল পাঁচখানা গায়ের মুখিয়া। তার ছিল একটিমাত্র মেয়ে 'সোনিয়া'। ছোটবেলাতেই সেই সোনিয়ার মা মারা গিয়েছিল বাবু৭ কিন্তু দয়ারাম আর সাদী করে নাই। মেয়েটাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। ক্রমে ক্রমে মেয়েটা লায়েক হয়ে উঠলো—গ্রাম-পঞ্চজন বললে, 'সোনিয়ার সাদী দাও দয়ারাম।' দয়ারাম পাশের দেওগাঁয়ের মুখিয়ার একমাত্র ছেলে ফাগুয়ার সাথে সাদীর সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললো। গ্রাম-পঞ্চজন সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। সোনিয়া আর ফাগুয়ার যেমন নামের মিল ছিল, তেমনি ছিল দু'জনকে দেখতে। ভগবান যেন দু'জনকেই দু'জনের জন্যে তৈরি করেছিল বাবু। কিন্তু—

—কিন্তু কি? ঔৎসুক্য চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া গৃহিণী

জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধ লোকটি বলিতে শুরু করিল : বলছি মাঈজী। ঐ ফাগুয়ার বাপ ডমরুটা ছিল একটা চামার। দিনের পর দিন খালি দাবী বাড়িয়েই যেতে লাগল। দু'শো পঞ্চাশ তঙ্কা বরকছ, ষাটটা ভইস, আরও কত কি।

গৃহিণী বলিলেন, বরকছ কি ?

বৃদ্ধটি বলিল—বরকছ মানে, আপনারা যাকে বরপণ বলেন মাঈজী। দয়ারাম প্রথমে কিছু বলে নি। তারও তো একটিমাত্র মেয়ে সোনিয়া। কিন্তু পরে যতই সাদীর দিন এগিয়ে আসতে লাগল, ততই দাবীর অঙ্ক বাড়তে লাগল—আর দয়ারাম গম্ভীর হয়ে যেতে লাগল। বন্ধু-বান্ধবেরা সাদী ভেঙ্গে দিতে বললো। কিন্তু দয়ারাম একগুঁয়ে, একবার যখন বাক্‌দান হয়ে গেছে, তা পাল্টানো যায় না।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, দয়ারাম কি সব দাবীই মেনে নিয়েছিল ?

বৃদ্ধলোকটি জবাব দিয়া বলিল—এজ্ঞে মাঈজী। দয়ারাম সব দাবীই মেনে নিয়েছিল। শুধু বাড়িটা ছাড়া তার সবকিছুই সাদীর পেছনে খরচ হয়ে গেল। এর পর দয়ারাম নিজমূর্তি ধরলো। সাদীর পর যখন ফাগুয়ার বাপ ডমরু তার বহু-বেটাকে নিয়ে যেতে এল, দয়ারাম তখন ছ'হাত লম্বা একখানা পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে পথ আগলে দাঁড়ালো। হেঁড়ে গলায় বললে—'ডমরু, তোর বেটাকে কাল সাদীর রাতে হামার কাছে বেচে দিয়েছিস, আজ বহু-বেটা লিতে আসিস কেনে ?' অবাক হয়ে ডমরু জিগাইল—'সে কি ? হামি তো হামার বেটার সাদীর বরকছ নিছি।' লাঠিখানা তুলে দয়ারাম বলল—'বরকছ মানে বিক্রি নয় ? তোর ছেলের সাদীর দরকার ছিল, হামার মেয়ে সোনিয়ার ভী সাদীর দরকার ছিল, লেকিন দাবী-দাওয়ার কথা উঠে কেনে ? তুই তোর বেটাকে বিক্রি করে দিছিস। এক-পা এগুলে তোর মাথা দু' ফাঁক কইরে দিবো।'

ডমরু যেন আকাশ থেকে পড়ে। এমন কেউ কথা বাপের জন্মে শোনে নি। অনেক কাঁদাকাটি করে, এমনকি সাদীর সমস্ত যৌতুক ফিরিয়ে দিতে চেয়েও, ডমরু তার বেটাকে ফিরিয়ে নিতে পারল না। সেদিন থেকে দু' গাঁয়ের মধ্যে মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা রোজ কি বাত্ হয়ে দাঁড়ালো।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, তারপর ফাগুয়ার কি হলো ?

—ফাগুয়াকে শ্বশুরবাড়ী থেকে কাঠ কেটে সংসার চালাতে হতো মাঈজী। দয়ারাম বেঁচে থাকতে ফাগুয়া তার বুড়িমাকে পর্যন্ত দেখতে পায় নি। দয়ারাম এমনিতে বড় দয়ালু ছিল বাবু ; কিন্তু ডমরুর কথা উঠলেই ক্ষেপে যেতো। কয়েক বছর পর ডমরু গুণ্ডা লাগিয়ে ঐখানটায় দয়ারামকে খতম করে দেয়। দয়ারাম মরে গেলে দু'গাঁয়ের ঝগড়াও কেমন আশ্চর্যভাবে থেমে গেল, কিন্তু ফাগুয়া তার বাপের কাছে আর ফিরে গেল না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধটি আবার কহিতে লাগিল, আজব বাত্ বাবু! সেই থেকে আশপাশের গাঁ থেকেও বরকছ প্রথা উঠে গেল। এতদিন হয়ে গেল, আজও তা সমানে চলছে।

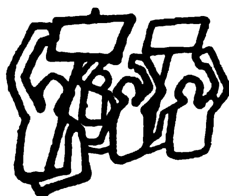
এমন সময় ড্রাইভার আসিয়া উপস্থিত হইল।—বাবু, গাড়ী ঠিক হয়ে গেছে।

—আচ্ছা চলো।

সময় কিভাবে কাটিয়া গিয়াছিল, টের পাই নাই। বৃদ্ধকে ধন্যবাদ দিয়া চলিতে শুরু করিয়াছি, গৃহিণী হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভারী গলায় বলিয়া উঠিলেন, এ পোড়া দেশে জ্ঞানী-গুণী লোক তো কম জন্মায় নি, কিন্তু দয়ারামের মত লোকের প্রয়োজন আজও আছে।

কথাটা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন কিনা বুঝিলাম না ; কারণ, একমাত্র বিবাহের সময়তেই পিতৃভক্ত সন্তান হইয়া দশ হাজার টাকা বরপণ লইয়াছিলাম। সে সময়ে ওটা গর্বের বস্তু

হইলেও, পরবর্ত্তী জীবনে আমাকে লজ্জা দিয়াছে অনেক বেশী। ভগবানের আশীর্বাদে রোজগারপাতি বর্তমানে মন্দ করি না—কোন একটা অজুহাত পাইলেই টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবার কথা ভাবিতেছি।



পঞ্চভুতচরিত



ঘোর অমাবস্যা। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। দূরে শ্মশানের ধিকি ধিকি আগুনের ফুলকি মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছিল। একটানা ব্যাঙের ডাক আর স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া। শেওড়াগাছের আড়ালে মামদোভূত কাহারও অপেক্ষায় লুকাইয়া বসিয়াছিল, চ্যাংভূতকে আসিতে দেখিয়াই পিছন হইতে জাপটাইয়া ধরিল—অ্যাঁই যেঁ দাঁদা, এবাঁর শোঁধ তুলঁব, পৃঁথিবীতে থাঁকতে বড্ডঁ জ্বাঁলিয়েছ।

চমকিয়া উঠিয়া চ্যাংভূত কহিল—দাদা, একটু ছাড় না, বড্ড লাগছে। আর দাদা, যদি কিছু মনে না কর, ক্ষেমা-ঘেন্না কবে চন্দ্রবিন্দুটা বাদ দিয়ে বলবে। নতুন আমদানি বুঝতেই তো পারছ, সব কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—ঠিক আছে, তোর দাবী না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু বাছাধন, আমার ব্যবসাটার বারোটা বাজিয়ে তোমার কি লাভটা হলো? একদিনে সবগুলি সোনার ডিম বার করতে গিয়ে মুরগিটাই মেরে ফেললি?

—কি করব, ইউনিয়ন দখল করতে গেলে, কিছু বাড়তি পাইয়ে না দিলে দল রাখব কি করে?

—তা বেশী কাজ করে বেশী পয়সা দিতে আমরা কি কোনদিন আপত্তি করেছি? খালি মাইনে বাড়াও, আর কাজের বেলা লবডঙ্কা।

—তা আমরা কি করব, তোমাদের সরকারের প্রশাসন যন্ত্র যদি 'প্রডাকশন ওরিয়েন্টেড' না হয়ে 'ভোট ওরিয়েন্টেড' হয়, তার জন্য দোষ কি আমাদের? আন্দোলন করলেই কিছু-না-কিছু পাওয়া যায়; সরকারও ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন না তুলে আমাদের কিছু দিয়ে দেবার জন্য মালিকপক্ষকে অনুরোধ করেন। এখন আমরা যদি আন্দোলনটুকুও না করি, লেবাররা আমাদের ছাড়বে কেন? আর নেতাদেরই বা কি জবাব দেবো? আমাদের দেবতা তো আর একটি নয়, তোমাদের আর কি, বড় একখানা তালা ঝুলিয়েই খালাস।

বিরক্ত হইয়া মামদোভূত কহিল—খালাস! হার্টফেল করে মারা গেলুম না?

—চটছো কেন দাদা, আমিও তো বেঁচে নেই, তোমার কোম্পানি লাটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীরা আড়ং ধোলাই দিয়ে আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিল না? আর গায়ের ব্যথা যেতে না যেতেই তুমি যেভাবে জাপটে ধরলে···।

চ্যাংভূতকে থামাইয়া দিয়া মামদোভূত কহিল—অ্যাই থাম্, একটা গোদাভূত আসছে।

একটা গোদাভূত একখানা পোড়া কাঠ লইয়া ওদিকেই আগাইয়া আসিতেছিল, চ্যাংভূতকে দেখিয়াই চংবং করিয়া লাফাইয়া উঠিল—দাদাবাবু, তুমি এখানে? আজ আর তোমার কোন খাতির নেই, খুব লম্বা লম্বা বাত—শোষিত জনগণ, বঞ্চিত জনগণ, মেহনতি মজদুর! দাঁড়াও আজ চেলা গাছটা তোমার মাথায়ই ভাঙবো।

চ্যাংভূত তাড়াতাড়ি মামদোভূতের পিছনে যাইয়া দাঁড়াইল। গোদাভূত বলিতে আরম্ভ করিল—বুঝলেন বাবুসাহেব, এই চামারের বাড়ীতে চাকরের কাজ করতাম, মাইনে তিরিশ টাকা, চব্বিশ ঘণ্টার ডিউটি, না ওভারটাইম, না গ্রেচ্যুটি, না বোনাস—কথাগুলো ওদের মিটিং ঘরে চা দিতে গিয়েই শিখেছি বাবু। হাতের উল্টো পিঠটা দিয়া চোখের গর্তগুলি একবার মুছিয়া লইয়া গোদাভূত আবার ধবাগলায় বলিতে আরম্ভ করিল—বুঝলেন বাবু, চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করেও নিজের বউ-ছেলেকে খাওয়াতে পারি নি। বউটা ঝি-গিরি করে কোনও পেকারে সংসারটা চালাতো বাবু। ছেলেটা অচিকিৎসায় মরেই গেল, ডাক্তার ডাকতেও পারি নি। বউটা পাগলা হয়ে গেল। ক'টা টাকা চামারটার কাছে আগাম চাইছিলাম, তেড়ে মারতি এলেন—বাজার থেকে দু-চার পয়সা সরানোর অজুহাতে চাকরিটা খেয়ে দিল বাবু। অ্যাদ্দিনে বাগে পেইছি।

মামদোভূত কোনও প্রকারে গোদাভূতকে শান্ত করিয়া বসাইল। গোদাভূত তবুও ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিতে লাগিল।

আশেপাশে চাহিতে চাহিতে ল্যাংচাভূত আসিতেছিল, গোদা-ভূতকে দেখিতে পাইয়াই তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে তাকাইয়া ল্যাংচাভূত বলিল—কি ব্যাপার! সবাই মিলে কি শলাপরামর্শ চলছে?

মামদোভূত কহিল—আর পরামর্শ! এখানে এসেও তো সেই ঝগড়াঝাঁটি গেল না।

ল্যাংচাভূত কহিল—না দাদা, কোথাও শান্তি নেই। পৃথিবীতে সরকার কুটিরশিল্পের দিকে নজর দিয়েছেন। আরে বাবা, হামাদের এই পাকিটমার সম্প্রদায় কি স্মল-স্কেল ইন্‌ডাষ্ট্রীজের আওতায় পড়ে না? হামাদের সম্প্রদায়ে যারা ডক্টরেট পেয়েছেন, কি পোষ্ট-গ্রেজুয়েট হয়েছেন, তারা তবু সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে দু'পয়সা কামাচ্ছেন—বিপদে পড়েছি এই আমরা পাসকোর্সের পাকিটমারেরা। ভদ্রলোকদের জামায় এখন আর পকেটের বালাই থাকে না। কলম হাতসাফাই করে যে দু'পয়সা কামাতাম ওভি গেছে। কোনটা দামী আর কোনটা সস্তা লেকিন বোঝবার উপায় নেই। দু'-দু'বার ফল্‌স খেয়েছি।

মামদোভূত আক্ষেপ করিয়া কহিল—তা তোমাদের প্রফেশন-টাই ভাল দাদা, লেবার ট্রাব্‌ল নেই, ইন্‌কাম ট্যাক্‌স নেই।

খট্ খট্ করিয়া দাঁত বাহির করিয়া ল্যাংচাভূত কহিল—সে আনন্দেই থাকুন দাদা, ইনকাম ট্যাক্‌স নেই, লেকিন পুলিস ট্যাক্‌স? আর লেবার ট্রাব্‌ল! ওভি শুরু হোয়ে গেছে। লোকের পাকিটে তো কিছু মিলবে না; তাই দল বেঁধে ওয়াগন ভাঙ্গতে হোয়। আর দল মানেই ডিমাণ্ড, আর সঙ্গে সঙ্গে মিট আপ না করলে পুলিসে খবর চলে যাবে। বুঝলে দাদা, হামরা মামাদের টাকাভি দিই, আবার গোলিভি খাই।

গাছের উপর হইতে গোলগোল চেহারার একটি গেছোভূত

নামিয়া আসিল। সকলে সমস্বরে হাউমাউ করিয়া উঠিল—তুমি এখানে কেন? মহা আরামে তো ছিলে।

গেছোভূত বিরক্ত হইয়া কহিল—আরাম! তা অনেক দিন পর এই শেওড়াগাছটার উপর বসে একটু দু'চোখ এক করে ছিলাম, তাও তোমাদের গণ্ডগোলে ভেঙ্গে গেল। পোড়া জায়গায় যদি দুটো স্লিপিং পিলও পাওয়া যেত?

মামদোভূত কহিল—কেন, পৃথিবীতে সরকারী চাকরি করে তো সারাটা বছর ঘুমিয়েই কাটিয়েছ, তবু ঘুমের শখ মেটে নি?

—তোমরা তো খালি ঘুমোতেই দেখেছ, কিন্তু না ঘুমিয়ে কি করব? এদিকে উপর থেকে সমানে চাপ, নতুন চাকরির সৃষ্টি করতে হবে। বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে। রাজস্ববৃদ্ধি না করলে আবার সরকার চলে না। সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রফিট মটিভেটেড্ নয়। সুতরাং যা হবার তাই হচ্ছে। ভরসা মাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি। তা তারাও চালাক হয়ে গেছে, বড় বড় তালা লাগিয়ে সট্‌কে পড়ে আমাদের বারোটা বাজিয়েছে। এদিকে কেউ কাজ করতে চায় না, কাজেই আমাকেও ঘুমিয়ে কাটাতে হয়। ওদিকে আবার দেখ, প্রডাকশন কম, দাম বাড়ছে। ডি-এ বাড়িয়ে আর কত ম্যানেজ করা যাবে? একটা সামলাই তো আর-একটা আসে। ছেলেদেরকেই ভয় বেশী। বড্ড গরম, কাণ্ডাকাণ্ডি বোধ কম, একদিন তো ধাঁ করে মাথাটাই ফাটিয়ে দিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিল।

দূরে গণ্ডগোল শোনা যাইতেছিল। মনে হইল একদল শাঁকচুন্নী আর কমবয়সী ভূত মিছিল করিয়া হৈ হৈ করিতে করিতে ওদিকেই আসিতেছে। নেপথ্যে—চলবে না, চলছে, চলবে ইত্যাদি শোনা গেল।

আঁতকাইয়া উঠিয়া গেছোভূত কহিল—এই মেরেছে, হতচ্ছাড়ারা এখানেও দল বেঁধে চাকরির সন্ধানে ধাওয়া করছে, আমি বাবা পালাই। বলিয়াই গেছোভূত লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলিয়া দৌড়াইতে

শুরু করিল।

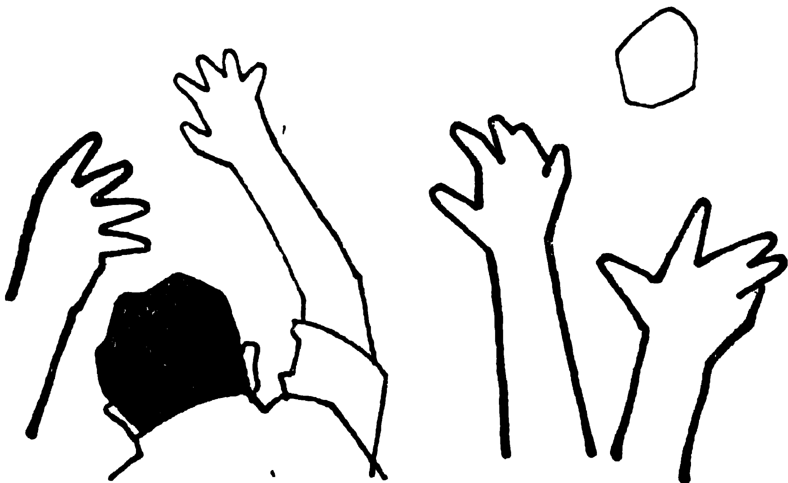
পিছন থেকে মামদোভূত বলিয়া উঠিল—গেছো দাদা, আমিও আসছি, একটু দাঁড়াও। আমার অফিসের কয়েকটিকেও দেখছি। আরে বাবা, গ্র্যাচুইটি আর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাটা মেরে দিয়েছিলাম……। বলিয়াই মরি কি পড়ি করিয়া দৌড়াইতে শুরু করিল।

চ্যাংভূত ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—দাদা, আমায় ছেড়ে যেও না। বলিয়াই পিছনে পিছনে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

গোদাভূত মিছিলে যোগদান করিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। ল্যাংচাভূত সড়াৎ করিয়া শেওড়াগাছের আড়ালে কাঁচিখানা বাগাইয়া ধরিয়া আত্মগোপন করিল। কপালে থাকিলে ঐ মিছিলের ভিড়ে দু'পয়সা কামাই হইয়া যাইতে পারে।



প্রতিষ্ঠা ?



"কি বললি গোবিন্দ? ইন্‌কাম-ট্যাক্সের ফাইল ভি আই পি হয়ে যায়!" বিঘতখানেক হাঁ করিয়া গণেশ গড়গড়ি লাফাইয়া উঠিল।

"তবে আর কি বলছি! তুমি তো খালি সেই দু'শ টাকার তাগাদায় আমায় ঘরছাড়া করার উপক্রম করেছ। আর আমি তোমার ভাবনায় নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ছেড়েছি"—গোবিন্দ মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকে।

"আরে বাবা, চটছিস কেন? ইন্‌কাম-ট্যাক্স আর পার্টির চাঁদার ঠেলায় প্রাণ বেরিয়ে যাবার যোগাড়। এদিকে তো কালোবাজারি, বুর্জোয়া—কত রকমের বিশেষণ যোগ করে বসে আছি।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিতে শুরু করিল, "বুঝলি গোবিন্দ, এবার নামের আগে চন্দ্রবিন্দুটা যোগ হলেই বাঁচি।"

"তোমার যেন কি! আরে দাদা, তোমাকে ওরা একটু-আধটু লোক-দেখানো বলে বটে, আবার তোমার কাছেই তো বাছাধনদের হাত কচলাতে হয়। তা দাদা, সিমেণ্টে কাদামাটি খানিকটা মেশাও তো—ওর ছিটেফোঁটা একটু গায়ে লাগলে চটলে চলবে কেন?"

চটিয়া গিয়া গণেশবাবু কহিলেন, "না মিশিয়ে কি উপায় আছে? এইভাবে কিছু টাকা ম্যানেজ না করলে এই পাঁচভূতের পুজো কি দিয়ে হবে? নিজেরা চুরি করলে দোষ নেই, আমাদের বেলাই যত আপত্তি। এর চেয়ে পশুপাখির জীবন অনেক ভাল; অন্তত কাকের মাংস কাকে খায় না। বুঝলি গোবিন্দ, অনেকবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, এবার থেকে সৎভাবেই চলব। ব্যস্, ঐ পর্যন্তই। আরে, কোন শালা পয়সা ছাড়া কাজ করে? তারপর কেউ কি আমাদের বিশ্বাস করে? ইন্‌কাম-ট্যাক্সের সত্যি হিসেব দিয়ে দেখি, তিনগুণ লাভ দেখিয়ে ট্যাক্স ধরে বসে আছে। এটা কি ধর্মতঃ কাজ হলো! জিজ্ঞেস করতে দাঁত বের করে জবাব দিলেন, 'তা আপনারা কি কোনো জন্মে সত্যি হিসেব দিয়ে থাকেন? তা ছাড়া, আপনাদের অবস্থাও আমরা বুঝি। মাথার ঘাম পায়ে

ফেলে একশ টাকা রোজগার করে পঁচাত্তর টাকা সরকারকে দিতে গায়ে লাগে বৈকি! তা যদি মনে করেন ট্যাক্স বেশী হয়েছে, আপীল করুন। আমারও ইয়ার এণ্ডিং কোটা ফুলফিল্ না করলে চলে কি করে?' একেবারে গলে জল হয়ে দোকানে এসেই ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি ধুলো মেশাবার হুকুম দিয়ে দিলাম।"

হাসতে হাসতে গোবিন্দ বলিল, "এবার ইন্‌কাম-ট্যাক্স বাঁচাতে চাও তো ভাল বুদ্ধি দিতে পারি?"

"বাত্‌লা দেখি একটা পথ, তোকে মাথায় করে রাখব।"

"আরে দাদা, পয়সা তো সাদা-কালো অনেক করেছ, এবার কিছু কালো টাকা ছেড়ে ইলেক্‌শনে দাঁড়িয়ে যাও না। এম এল এ, এম পি হলে দেখবে, ফাইলটা ভি আই পি হয়ে গেছে। তখন যা হিসেব দেবে, তাই মঞ্জুর।"

"এটা মন্দ বলিস নি গোবিন্দ। রামা, শ্যামা, যদু, মধুও এখন এম পি, এম এল এ হচ্ছে। তা চেষ্টা করে দেখলে মন্দ কি?"

উৎসাহিত হইয়া গোবিন্দ বলিতে থাকে, "তবে হ্যাঁ, তোমার মত অত কিপটে হলে হবে না। দু'পয়সা খরচা করতে হবে। মোদ্দা কথা, পপুলার হতে হবে তো?"

"তোর খালি টাকা-পয়সা খরচা করার ফন্দি। কেন, লেবার লীডার হলে কেমন হয়? পয়সায় পয়সা, নামে নাম।"

বিরক্ত হইয়া গোবিন্দ বলিল, "এইজন্যেই তোমার কিছু হয় না দাদা। আরে বাবা, লেবার লীডার হয়ে নাম কিনতে পারলে এই শর্মাও অ্যাদ্দিনে মন্ত্রী হয়ে যেত। এই যে বাড়ী থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, সে কি তোমার ঐ পাওনা টাকার ভয়ে?"

"কেন, তোর আবার কি হলো?"

"আর কি হলো? কোথাও চাকরি-বাকরি না পেয়ে, নেমে পড়লাম রাজনীতিতে। নেতাদের দেওয়া কয়েকখানি চটি বই পড়ে, নিজেই একদিন লীডার বনে গিয়ে একটা ইউনিয়নকে হাত করে ফেললাম। তারপর ছত্রিশ দফা দাবী নিয়ে চেপে ধরলাম

মালিকপক্ষকে। কিন্তু বেড়ালের ভাগ্যে কি আর শিকে ছিঁড়বে? পরদিন নিয়মমাফিক গেট-মিটিং করতে গিয়ে দেখি, গেটে বড় একটা তালা ঝুলছে। খবর নিয়ে জানলাম, মালিক বেপাত্তা। বোঝ ঠেলা, কর্মচারীরা আমাকেই দায়ী করছে। দেখা হলেই বদন বিগড়ে দেবে। তাই তো পালিয়ে বেড়াচ্ছি। হবে লীডার?"

"মেলা বকিস নি, কি করতে হবে বল।"

"ব্যস্ত হচ্ছ কেন? লেখা-টেখা কিছু আসে? তা হলে, কাগজওয়ালাদের হাত করে ছাপাবার বন্দোবস্ত করি। অবশ্য কিছু খরচা হবে।"

হঠাৎ কি মনে পড়িয়া যাওয়ায় গণেশবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "গবা, আবার কাগজ দেখাচ্ছিস? গতবার পুজোয় দু'-দু'শো টাকা চাঁদা দিয়ে রিশেপসন্ কমিটির চেয়ারম্যান হলাম। কয়েক-শো টাকা খবরের কাগজের রিপোর্টারদের খাওয়াবার নাম করে ভোগা দিলি। আবার কাগজ?"

নাক-কান মলিয়া কাঁদো কাঁদো হইয়া গোবিন্দ কহিল, "দাদা, তুমি আমায় অবিশ্বাস করো? সে টাকা দিয়ে 'চাঙওয়ায়' নিয়ে গিয়ে ওদের খাওয়াই নি?"

"খাইয়ে আমার কি লাভটা হলো শুনি? সবাইকে ঠেলেঠুলে মিনিস্টারের সঙ্গে ছবিটা তোলালাম, আর পরদিন কাগজ খুলে দেখি, মিনিস্টারের পাশে শুধু রয়েছে আমার আধখানা কান। কেন, ইট-সুরকির পয়সা কি আর পয়সা নয়।"

"তুমি খালি রেগেই আছ। তোমার তাগাদার চিঠি পড়ে মনে হয়েছিল, বোধহয় তোমার লেখা-টেখা আসে, তাই বলা।"

"তাও কি চেষ্টা করি নি? অনেক বড় বড় কাগজে দিস্তা দিস্তা গল্প, উপন্যাস পাঠিয়েছি। কিন্তু না, অশ্লীল জিনিস না হলে আজকাল ওঁনারা কাগজে ছাপেন না। আর, তোর বৌঠানকে জানিস তো? একেবারে খাণ্ডাররূপিনী; যদি একবার জানতে

পারে যে, ঐ ছাইপাঁশগুলি আমার লেখা, তবে আর দেখতে হবে না, ঝেঁটিয়ে ভূতছাড়া করবে, এমনিতেই তো সন্দেহবায়ু।"

গোবিন্দ কি যেন বলিতে যাইতেছিল। থামাইয়া দিয়া গণেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, "বিনোদ দত্ত আসছে। কিছু যেন জানতে না পারে, বেটা এক নম্বরের হিংসুটে। তার চেয়ে কাল আসিস, পরামর্শ করা যাবে।"

"সেই ভাল," বলিয়া যাইতে যাইতে গোবিন্দ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "গনেশদা, গোটা কুড়ি টাকা দাও তো, মানিব্যাগটা বাড়ী থেকে নিয়ে বেরুতে ভুলে গেছি।"

"এ রকমের ভুল এবার নিয়ে ক'বার হলো রে গোবিন্দ?" বলিয়া গণেশবাবু দশ টাকার দু-খানা নোট গোবিন্দর হাতে গুঁজিয়া দিলেন।

* * *

দিন দশেক পরে একদিন গোবিন্দ গণেশবাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। কড়া নাড়ার শব্দে গণেশবাবু নীচে নামিয়া আসিয়া গোবিন্দকে দেখিয়া বলিলেন, "কি ব্যাপার! দোকানে না গিয়ে এখানে যে?"

"একটা ভাল খবর আছে দাদা, একটু গোপনীয়। এবার তোমার বিখ্যাত হবার পথ পেয়ে গেছি।"

ভিতরের দিকে তাকাইয়া গণেশবাবু কহিলেন, "চল, বাইরে ঐ গাছতলাটায় গিয়ে বসি।" চলিতে চলিতে আক্ষেপ করিয়া তিনি কহিলেন, "জানিস তো, তোর বৌঠানকেও আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু কি কুক্ষণে যে পণ্ডিত বংশে বিয়ে করেছিলাম, শুভ কাজে খালি ব্যাগড়া..."

চারদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া গাছতলার বাঁধানো চাতালটার উপর বসিয়া পড়িয়া গণেশবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "কি রে, প্ল্যানটা বল।"

"দাদা, পাঁচগাঁয়ে পল্লীমঙ্গল সমিতির বাড়ী করার সময় কিছু

মালমসলা সাপ্লাই করেছিলে, তার দাম পেয়েছ ?"

বিরক্ত হইয়া গণেশবাবু বলিলেন, "কই আর পেলাম, বেটারা আমার প্রায় চারশ' টাকা মেরে দেবার তালে আছে। আমিও উকিলের চিঠি দিয়েছি।"

"উকিলের চিঠিটা তুলে নাও, আমি ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। আগামী শনিবার ওদের বার্ষিক সম্মেলন-সভা বসবে। তোমাকে সভাপতি করা হবে। পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রীমশাই হবেন প্রধান অতিথি। তবে হ্যাঁ, তোমার পাওনা টাকাটা ওদের ডোনেশান দিতে হবে।"

"টাকা ছাড়া তোর আর কোন কথা নেই গোবিন্দ।" এক্টু ভাবিয়া বলিলেন, "তা যাক, অনেক টাকাই তো উপার্জন করলাম, এবার একটু নাম-ডাক না হলে আর সমাজে মাথা তুলে দাঁড়ানো চলবে না। ঠিক আছে, কথা দিলাম সভাপতিত্ব করব।"

বিগলিত হইয়া গোবিন্দ কহিল, "সেকথা আমি দিয়েই এসেছি—।" তারপর গণেশবাবুর দিকে আড়চোখে চাহিয়া বলিল, "আমার কাজে কোন ফাঁক পাবে না গণেশদা। পাছে নিমন্ত্রণের চিঠিতে তোমার নাম না ছাপে, তাই নিজেই চিঠি ছাপানোর দায়িত্ব নিয়ে এসেছি, না হয় শ-খানেক টাকাই খরচা হবে, তা বলে কি এ সুযোগটা হেলায় হারাব ?"

টাকার কথায় চটিয়া উঠিয়া গণেশবাবু কহিলেন, "তুই কি আমাকে পথে বসাবি গবা ?…"

গণেশবাবুকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই গোবিন্দ বলিয়া উঠিল, "তুমি তো আমার কোন কাজটাই ভাল চোখে দেখ না। এদিকে বিনোদখুড়ো পাঁচশ টাকার নোট হাতে করে আমার পেছন পেছন ঘুরছে। যদি তাকে ওখানে একবার সভাপতি —নিদেনপক্ষে বক্তা হিসাবেও দাঁড় করিয়ে দিতে পারি…"

বাধা দিয়া গণেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, "বিনোদ দত্তর ঐ গাঁয়ে আবার কিসের দরকার ? বেটা যেন শনি। যেখানে আমি—

সেখানেই ওর হাজির হওয়া চাই। এদিকে তো আঙুল দিয়ে জলটুকুও গলে না।"

"তাও জান না? দত্তখুড়োর তৃতীয় পক্ষ যে ঐ গাঁয়ের মেয়ে, শ্বশুরবাড়ীতে একটা প্রেষ্টিজ…।"

"নিকুচি করেছে তোর প্রেষ্টিজ…। যা, চিঠি ছেপে ফেল। বিকেলে দোকানে এসে টাকাটা নিয়ে যাস।"

গোবিন্দ যাইবার উপক্রম করিতেই পিছন হইতে গণেশবাবু ডাকিয়া বলিলেন, "অ্যাই শোন, প্রথম নিমন্ত্রণের চিঠিটা ঐ চামারটাকে দিয়ে আসবি। বেটা জানুক, আমিও কম কেউ-কেটা নই।"

"ঠিক আছে গণেশদা, সে আমাকে বলে দিতে হবে না," এই বলিয়া মুচকি হাসিয়া গোবিন্দ ছাপাখানার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

নির্দিষ্ট দিনে গণেশবাবু গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া পাঁচগাঁয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। সভামঞ্চ মন্দ সাজানো হয় নাই, তবে গণেশবাবুর মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় মন্ত্রীমহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। খবরটা গোবিন্দর নিকট হইতে শোনা। পূর্ব-পরিকল্পিত কিনা যাচাই করিয়া লইবার উপায় নাই। সমিতির সভাপতি গ্রামের প্রবীণ সমাজসেবী চিরকুমার সদানন্দ ব্রহ্মচারী গণেশবাবুকে বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। গোবিন্দ এক ফাঁকে আশ্বাস দিয়া গিয়াছে, যথাসময়ে কাগজের রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফারগণ সভায় উপস্থিত হইবেন। মনঃক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই—ইত্যাদি, ইত্যাদি—

যথাসময়ে সভার কাজ আরম্ভ হইল। উদ্বোধন সঙ্গীত, মাল্যদান এবং অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতা শেষ হইবার পর সদানন্দবাবু গণেশ-বাবুকে সভাপতির ভাষণ দান করিতে অনুরোধ করিলেন।

মৃদুহাস্যে গণেশবাবু সভামঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দূরে বিনোদ

দত্তর চকচকে টাকটি যেন একবার দেখা দিয়াই দর্শকদের মধ্যে মিলাইয়া গেল। গণেশবাবু মনে মনে একটু গর্ব অনুভব করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, হিংসুটে দত্তকে খুব একহাত লওয়া হইয়াছে।

গণেশবাবু স্বামীজির স্টাইলে বলিতে শুরু করিলেন: "আমার প্যাঁচগাঁয়ের ভাই ও ভগ্নীগণ, [যদিও ভগ্নীরা কেহই সভায় উপস্থিত ছিলেন না, তবু পরে আসিতে পারে মনে করিয়া তাঁহার বক্তব্য আর সংশোধন করিলেন না] আজ এই শুভদিনে আপনারা আমাকে সভাপতির পদে বরণ করিয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য আসনে বসাইয়া নিজেদের যে যোগ্যতার পরিচয় আপনাবা দিয়াছেন, তাহা সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নূতন আলোকপাত করিবে। ইহা একটি অনুকরণযোগ্য বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি। আমি আপনাদের আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

"আজ বিভিন্ন বক্তাগণ গ্রামাঞ্চলের দুর্দশার কথা নানাভাবে নানা ভঙ্গিমায় বার বার বলিয়াছেন, কিন্তু কেহ কি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন? যে জমিদারগণের বাগানবাড়ী বাইজীদের নূপুরনিক্কণে মুখরিত হইয়া উঠিত, তাহা এখন চামচিকার আবাস-ভূমি। যে পুকুরঘাটে চণ্ডিদাস-রামীর বার বার আগম-নিগম হইত, সেই পুকুর এখন কচুরিপানায় ভর্তি। ইহার কারণ, গ্রামের ধনিক সমাজ, শিক্ষিত সমাজ শহরের মোহে গ্রাম-মাতৃকাকে অবহেলা করিয়াছে। এজন্যই কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, 'পল্লি, আমায় ছেড়ে কোথায় চল্লি'?"

[সভাস্থল হইতে গুঞ্জন শোনা গেল, বেটা টেনে এসেছে।]

গণেশবাবু বলিয়া চলিয়াছেন, "তবু আপনারা ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। তবু মেরুদণ্ড সোজা করিয়া নিজ গুণে, নিজ ধৈর্যে আপনারা মাথা উঁচু করিয়া অবস্থান করিতেছেন।"

[দর্শকদের ভিতর হইতে গোবিন্দ বলিয়া উঠিল, "হিয়ার! হিয়ার।"]

উল্লসিত হইয়া গণেশবাবু আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমি জানি, আপনাদের শক্তির উৎস কোথায়।" ইঙ্গিতে সদানন্দবাবুকে দেখাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আপনাদের মহাভাগ্য, সদানন্দবাবুর মত চিরকুমার সমাজ-সেবককে আপনারা পাশে পাইয়াছেন। ইনি দেশের জন্য জেল খাটিয়াছেন। অবশ্য আমিও একবার জেলে যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। যাক সে কথা, এখন সদানন্দবাবুর কথাই বলি। সদানন্দবাবু তাঁহার এই ত্যাগের অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন তাঁহার পিতৃদেবের নিকট হইতে। ইঁহারা বংশানুক্রমে দেশসেবা করিয়া আসিতেছেন।

"সদানন্দবাবুর গুণের কথা একমুখে শেষ করা যায় না। উনি দেশের কাজের জন্য বিবাহ পর্যন্ত করিবার সময় পান নাই, ঠিক তাঁহার পিতার মতই চিরকৌমার্য গ্রহণ করিয়াছেন..."

সভাস্থল হৈ হৈ করিয়া উঠিল। পচা ডিম, ইট-পাটকেল কিভাবে যোগাড় হইয়া গিয়াছিল জানি না। চারিদিকে শুধু 'মার, মার' শব্দ। টেবিল-চেয়ার উল্টাইয়া আহত গণেশবাবুকে কোন প্রকারে টানিয়া লইয়া ক্ষেতের ভিতর দিয়াই গোবিন্দ দৌড়াইতে শুরু করিল।

গণেশবাবু মালাগাছটা লইয়া আসিবার জন্য বার দুই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাণের মায়ায় প্রাণাধিক মালাটিকে সভাস্থলেই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ইহার পর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। গণেশবাবু গোবিন্দর সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। গিন্নী গণেশবাবুকে সাফ সাফ জানাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার পতি হইয়াই যথেষ্ট হইয়াছে, আর সভার পতি হইয়া বিখ্যাত হইবার প্রয়োজন নাই। ইট-সুরকির ব্যবসায়ে মন না উঠিলে লোটা-কম্বল লইয়া হরিদ্বার যাইতে রাজী আছেন, তবু বুড়ো বয়সে স্বামীর পিঠে পুরাতন ঘৃত মালিশ করিয়া হাড় কালি করা আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

রাহুগ্রস্ত



তাসের প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রশান্ত বলল, "দেখ প্রণব, আর তাস খেলতে ভাল লাগছে না। তাস পিটে পিটে তো চার বছর চলে গেল—এ শালা বাংলাদেশে আর ভবিষ্যৎ নেই।"

তাসের প্যাকেটটা সরিয়ে রেখে প্রণব বলল, 'কি হলো, আজ আবার কোথায় চোট খেলি?"

"আর বলিস কেন, কাল নবীনকাকার ওখানে গিয়েছিলাম।" অ্যাসট্রে থেকে পোড়া চারমিনারের শেষ অংশটা তুলে নিয়ে ধরাতে ধরাতে বলল, "সমীরের স্যুটটা ধার করে দুপুর রোদে গড়িয়া থেকে বারাসাতে নবীনকাকার ফ্যাক্টরীতে গিয়ে দেখি, বড় এক-খানা তালা ঝুলছে।"

"কেন, কি ব্যাপার?" প্রণব জিজ্ঞেস করে।

প্রশান্তর হয়ে পাশ থেকে নিখিল বলে উঠল, "বাবা বুঝলে না? লক আউট।"

"ঠিক তাই।" প্রশান্ত বলল, "পাশে কতগুলি লোক জটলা করছিল। কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করতেই খেঁকিয়ে যেন মারতে এল। যাও-বা একটা সেল্‌সম্যানের চাকরির আশা ছিল, সেটাও গেল।"

ম্লানমুখে নিখিল বলল, "মন খারাপ করে কি করবি বল। এই দেখ, সকাল ন'টার সময় নাকে-মুখে কিছু গুঁজে চাকরি খোঁজার নাম করে সোজা ক্লাবে এসে আড্ডা দিচ্ছি। চাকরি কি পথেঘাটে মেলে? কিন্তু কে বুঝবে, বাড়ী থাকাই দায় হয়ে উঠেছে।"

এক কোণে বসে মলয় খবরের কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপন-গুলি দেখছিল। নিখিল মলয়কে ধাক্কা দিয়ে বলল, "ও পাতাটা বাদ দিয়ে পড় বাবা, কিছু হবে না। তার চেয়ে বরং পাত্র-পাত্রীর পাতাটা খুলে দেখ, যদি কিছু হয়। শালা, নিরুদ্দেশ-টেশ কিছু থাকে না যে, খুঁজে দিলে হাজারখানেক টাকা পাওয়া

যায়, নিদেন শ' পাঁচেক।"

"থাম রাসকেল," মলয় কাগজটা গুটিয়ে রেখে বলল, "আচ্ছা আজ কি বার রে?"

নিখিল বলে ওঠে, "কেন চাঁদ, খবরের কাগজটা তো গিলছিলে, সিনেমার পাতাটা দেখেও কি বুঝতে পারো নি যে আজ শুক্রবার!"

"সত্যি খেয়াল ছিল না।" তারপর একটু থেমে মলয় আবার বলে উঠল, "আচ্ছা, আজ হিমাংশুর আসার কথা ছিল না?"

প্রণব হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, "হুর্‌রে! ঠিক মনে করেছিস, আজকের সকালের ট্রেনেই তো দাদুর উইলের পাওনা দু'লাখ টাকা নিয়ে তার আসার কথা।"

মলয়ের পিঠ চাপড়ে নিখিল বলে ওঠে, "তোর তো খুব মনে থাকে শালা!"

খুশীমনে মলয় বলে, "আরে বাবা, মনে না রেখে কি পারি? যাবার সময় হিমাংশু বলে যায় নি যে, টাকাটা পেলেই আমাদের সবাইকে নিয়ে একটা জাঁকালো ব্যবসা ফেঁদে বসবে!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। হিমুই আমাদের একমাত্র ভরসা।"

নিখিলের কথায় সায় দিয়ে প্রশান্ত বলে উঠল, "সত্যি, হিমু আমাকেও অনেকদিন বলেছে, গুজরাটী, সিন্ধী, মারোয়াড়ী, এরা সবাই ব্যবসা করে লাল হয়ে গেল। আমরা বাঙ্গালীরাই শুধু চাকরি চাকরি করে পিছিয়ে আছি।"

"তবেই বোঝ, যত মুস্কিল, তত আসান," বলিয়া নিখিল প্রণবের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাহলে কিছু তেলেভাজা নিয়ে আয়, মোড়ের মাথায় দামুদার দোকানে ভাজছে দেখে এলাম।"

একটা আধুলি নিখিলের দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রণব বলল, "তুই নিয়ে আয় নিখিল। আমার কাছে ওর প্রায় দু'মাসের বাকী পরে আছে।"

"ঠিক আছে, সব শালার ধার ডাবল করে ফিরিয়ে দেবো,

হিমু এসে যাচ্ছে," বলতে বলতে নিখিল আধুলিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিখিলের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে প্রণব বলল, "মাত্র সাড়ে বারো টাকার জন্য আমার ঐ পথে চলাফেরা করাও বন্ধ হয়ে গেছে।"

মলয় গাহিয়া উঠল, "জল ভরা মেঘ রয় না, রয় না চিরকাল।"

"গান থামা তো। তোর ঐ রাসভ কণ্ঠ আর সহ্য করা যায় না।"

"তা না হয় থামাচ্ছি, তা হিমাংশু কিসের ব্যবসায় নামবে তার কিছু প্লান করেছিল?"

প্রণব বলল, "সত্যি, পাকাপাকিভাবে প্ল্যান করে ফেলতে হবে। মোটর গ্যারেজ, পালিশিং, প্রিন্টিং না ইলেকট্রনিক্সের..."

প্রণবকে থামিয়ে দিয়ে প্রশান্ত বলে ওঠে, "টেলিভিশন লাইনটারও প্রসপেক্ট আছে।"

এমন সময় একটা ট্যাক্সি এসে ক্লাবের সামনে দাঁড়াল। ট্যাক্সি হতে হিমাংশুকে নামতে দেখে সকলে একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে, "হুর্‌রে। হিমাংশু এসে গেছে—ভেতরে আয়, ভেতরে আয়।"

মলয় হিমাংশুর হাত থেকে সুটকেশটা নামিয়ে নেয়। হিমাংশু ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ভিতরে এসে তক্তাপোষের একপ্রান্তে বসে পড়ে।

ঔৎসুক্য আর চেপে রাখতে না পেরে প্রশান্ত জিজ্ঞেস করল, "কি রে, টাকাটা পেয়েছিস?"

হিমাংশু ইণ্ডিয়া কিং সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "পাব না মানে? সুজাতার বাবা যে বড্ড কাজের লোক..."

কৌতুক করে মলয় বলে উঠল, "তা আর হবে না, হবু জামাই-এর জন্য এটুকু না করলে চলবে কেন? তারপর তোর সুজাতার খবর কি?"

হিমাংশু ফিক্ করে হেসে ফেলে বলল, "আর বলিস কেন? একেবারে বিয়ের পাকাপাকি দিন ঠিক করিয়ে ছাড়ল, দশই শ্রাবণ; দেখিস, তোদের ভরসাতেই আছি। আবার যেন বায়নাক্কা তুলিস না?"

মলয়, প্রশান্ত, প্রণব সকলেই সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল, "কন্‌গ্রাচুলেশন।"

মলয় একপাক নেচে নিয়ে বলল, "তুই সত্যি ভাগ্যবান হিমু—রাজত্ব আর রাজকন্যা এক সঙ্গে।"

হাসিমুখ লুকিয়ে হিমাংশু বলল, "রাজত্ব, রাজকন্যা জানিনে, তবে সুজাতা মেয়েটা সত্যি ভাল।"

"তা আর বুঝি না চাঁদ?" প্রণব হিমাংশুর থুতনিটা নেড়ে দিল।

মলয় হিমাংশুর সিগারেটের প্যাকেট হতে একটা সিগারেট দেশলাইয়ের বাক্সের উপর ঠুকতে ঠুকতে বলল, "আচ্ছা বাবা, সব যেন হলো—এবার ইতরজনের ব্যবস্থা কি করেছিস বল?

"আচ্ছা পেটুক কোথাকার?" হাসতে হাসতে হিমাংশু জবাব দেয়।

বাধা দিয়ে মলয় বলে ওঠে, "না রে, খাবার কথা বলছি না। তোর ব্যবসা কবে শুরু করছিস বল। আমরা তো সব হা-পিত্যেশ করে বসে আছি।"

সকলকে হতাশ করে হিমাংশু বলল, "না রে, ব্যবসা আর করা হলো না।"

আর্তস্বরে প্রশান্ত বলল, "সে কি রে?"

"হ্যাঁ ভাই, সুজাতা একেবারে বেঁকে বসলো, বললে—বাড়ীর মূর্খ ছেলে হয় গুরুগিরি করে, নয় তো ব্যবসা করে। তুমি এম-এ পাশ করে ব্যবসা করলে আমি বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাবো কি করে? তারপর অনেক হিন্দি সিনেমায় দেখেছি, ব্যবসায়ী মাত্রেই মদ্যপ, চরিত্রহীন আর চোরাকারবারী হয়।

তোমার বড়লোক হয়ে কাজ নেই।"

"তুই তাই বুঝলি ?"—অবাক হয়ে মলয় জিজ্ঞেস করে।

"না বুঝে কি করি বল," হিমাংশু বলল, "সংসারটা তো আমার একার হচ্ছে না, তবু প্রায় ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একবার একটা বাংলা আধুনিক থিয়েটারে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখলাম, একজন ডাকাত বলছে যে, তারা মানুষ খুন করার পন্থা পালটাচ্ছে ; মানুষের রক্ত তারা শুষবে, তবে ছোরা মেরে নয়, কলকারখানার মাধ্যমে। দেখে সুজাতা তো রেগেই আগুন। আমায় বললে—তুমি কি টাকা খরচ করে ডাকাতের বদনাম নিতে চাও ?

"নিজেও ভেবে দেখলাম, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। দু'লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিলে অন্ততঃ হাজার পনের টাকা সুদ পাব। আর ঐ ব্যাঙ্কে ক্যাস ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে আট ন'শ টাকা মাইনে পাওয়া যাবে।"

হতাশভাবে প্রশান্ত বলল, "ব্যাঙ্কেই চাকরি নিয়েছিস নাকি ?"

"হ্যাঁ, সুজাতার বাবাই ঠিক করে দিয়েছে। ঐ ব্যাঙ্কের নামেই ড্রাফ্‌টা করে নিয়ে এলাম।"

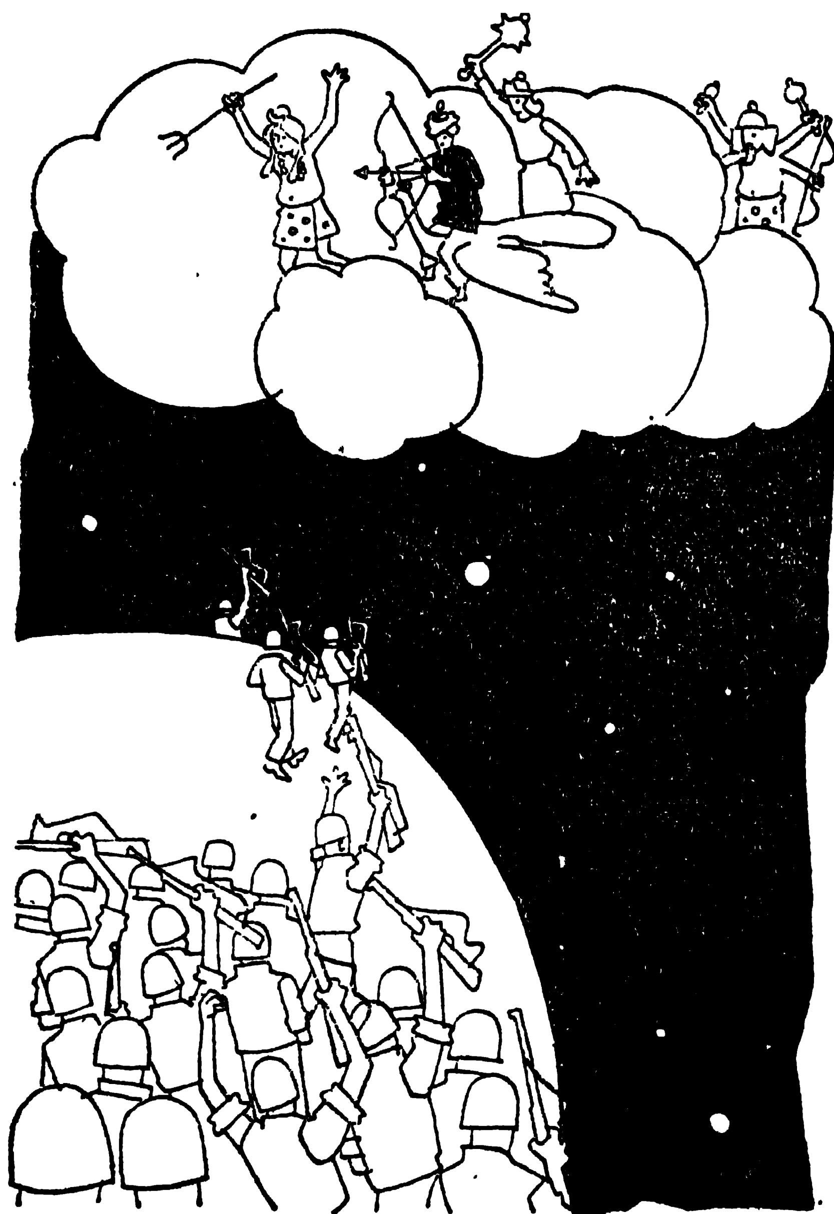
প্রশান্ত মলয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "হিমাংশু ঠিকই করেছে, আমাদের কথা···থাক, তা হিমাংশু, তোর বিয়েতে নেমন্তন্ন করছিস তো ?"

অপ্রস্তুত হইয়া হিমাংশু বলল, "হ্যাঁ, কি যে বলিস।" তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি এবার যাই রে। ড্রাফ্‌টা আজ ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে।"

হিমাংশুর যাবার পথের দিকে তিন বন্ধু হতাশভাবে তাকিয়ে থাকে, দামী ইণ্ডিয়া কিং সিগারেটটা নিজে নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

নিখিল তেলেভাজার ঠোঙা নিয়ে এল। সব শুনে তেলেভাজাগুলি বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "শালা······

আয়ুধ



স্বর্গরাজ্যে অকালে বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হইয়াছে। পুরানো মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম। মন্ত্রীদের বৈশিষ্ট্য জাহির করিবার ফলে আজ স্বর্গরাজ্যের প্রায় পঞ্চত্বপ্রাপ্তির অবস্থা। দেবরাজ ইন্দ্রের সোনার বর্ণ কালি হইয়া গিয়াছে, সহস্র চক্ষেও সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। আহার-বিহার বন্ধ। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা বেগতিক দেখিয়া পূর্বেই মর্তে সটকাইয়াছেন। নাচঘরে অপ্সরীদের নূপুরনিক্কণ আর শোনা যায় না। বাদকগণও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। ঘোরতর যুদ্ধেব আশঙ্কায় দেবগণ শিটাইয়া উঠিয়াছেন।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে দৈত্যগণ কর্তৃক স্বর্গরাজ্য বার বার আক্রান্ত হইয়াছে। জয়-পরাজয় দুই পক্ষেরই হইয়াছে, তবে বুদ্ধিবলে চূড়ান্ত ফলাফল নিজেদের দিকে টানিয়া লইতে দেবতাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই, কিন্তু এবারের অবস্থা অচিন্তনীয়।

নরলোকের অধিবাসীরা এককাট্টা হইয়া স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিবে বলিয়া গুজব শোনা যাইতেছে। বিশ্বস্তসূত্রে এইমাত্র খবর আসিয়াছে, নরগণ গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে এই পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা চালাইয়া যাইতেছে। দেবরাজ আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। এবার স্বর্গরাজ্য রক্ষা করা তাহার কর্ম নয়। গোপন মন্ত্রণাকক্ষে দেবরাজ সক্ষোভে ব্রহ্মাকে কহিলেন, "আপনার খেয়ালের মাশুল দিতেই আজ আমাদের এই অবস্থা, পৃথিবী সৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল ?"

বিরক্ত হইয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "এখন তো বলবেই। দেবলোকের বংশবৃদ্ধিতে স্থানাভাবের কথা চিন্তা করিয়া তোমরাই তো আমাকে পৃথিবী সৃষ্টির অনুরোধ করিয়াছিলে ? তা সৃষ্টি না হয় আমি করিয়াছিলাম, কিন্তু লালন-পালনের দায়িত্ব তো বিষ্ণু লইয়াছিলেন—তিনিই বা কি কর্তব্য সাধন করিয়াছেন ?"

রাগতভাবে বিষ্ণু উত্তর করিলেন, "আমার তো দোষের অন্ত নাই। তোমরাই আমাকে পৃথিবীতে দেবতাদের বাসোপযোগী

করাইবার জন্য মনুষ্যজাতিকে গড়িয়া তুলিতে বলিয়াছিলে, এজন্য আমাকেও কয়েকবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। মানসিক ও শারীরিক কষ্টও কম সহ্য করিতে হয় নাই, কয়েকবার অপঘাত মৃত্যুর কথা না হয় নাই তুলিলাম। দেবগণের সংমিশ্রণে যে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি, তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি তোমাদের তুলনায় নিম্নমানের হইবে কেন ?"

বিষ্ণুকে থামাইয়া দিয়া একগাল ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে মহেশ্বর বলিলেন, "তবেই বোঝ, ধ্বংসের দেবতা বলিয়া আমাকে দোষ দেওয়া যায় না। নরগণ আমার প্রতিটি অস্ত্রের প্রতিবিধান আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ করাইয়াও দেখিয়াছি, ইহাদের বাগে আনা যায় না।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, "নূতন অস্ত্রের কথা চিন্তা করিতে করিতে আমার গঞ্জিকার ভাণ্ড প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিল।"

"নারায়ণ, নারায়ণ"—বীণাটি আসনের পাশে রাখিয়া নারদমুনি বলিলেন, "আজ্ঞে, গোড়া কর্তন করিয়া অগ্রদেশে জল সিঞ্চন করিয়া যেমন বৃক্ষতে প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব নয়, তেমনি······"

নারদমুনির কথা শেষ হইবার পূর্বেই দেবরাজ ধমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "তুমি থাম। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যে আর উপদেশ দিতে আসিও না। তুমি তো কেবল গণ্ডগোল পাকাইতেই জানো," তারপর বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমরা তো আরো অনেক গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছি। সে-সব স্থানে তো কোন অশান্তি নাই।"

বিষ্ণু কহিলেন, "সেখানে নাই, কিন্তু এখানে আছে। মানব-সমাজের কল্যাণের জন্যই দেবগণের পৃথিবীতে যাতায়াত —এ ভাঁওতা নরগণ ধরিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা বিশ্বাস করে, দেবতাগণ স্বীয় প্রমোদ-বিহারের জন্য পৃথিবীকে উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহার করিতেছে এবং পূজা-পার্বণের মাধ্যমে শোষণের অন্ত নাই। নরগণের বুঝিতে কিছুমাত্র ভুল হয় নাই যে, তাহারা দেবগণের

দ্বারা শোষিত, নিষ্পেষিত এবং নিপীড়িত। মর্তের ঐশ্বর্য-সম্ভার যে স্বর্গরাজ্যের প্রাচুর্য বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা তাহাদের আর জানিতে বাকি নাই। তারপর লোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, একটার পর একটা ইন্ধন যোগাইয়া যাইতেছে।"

হঠাৎ একটা কথা মনে হইতেই ইন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, আবার প্লাবনের সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীকে ডুবাইয়া মারা যায় না···?"

দেবাদিদেব মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাহাতেও কোন কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। পূর্বেও নোয়াকে বাঁচাইয়া চল্লিশ দিনব্যাপী প্লাবনের সৃষ্টি করিয়া দেখিয়াছি, কোন কাজ হয় নাই। এখন তো মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষে, তদুপরি পৃথিবীর নরগণ একযোগে স্বর্গ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে। এতকাল বিচ্ছিন্নভাবে দৈত্য-দানবদের দমন করিতেই হিমসিম খাইতে হইয়াছে। এবার এই একত্রিত শক্তির বিরুদ্ধে···ভাবিতেও ভয় হয়"—দেবাদিদেব ভাং-এর পাত্রটি টানিয়া লইলেন।

নারদমুনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "এতক্ষণে বুঝিলাম, মর্তের নরগণের সংহতির ভয়েই স্বর্গরাজ্য কম্পমান।" একটু থামিয়া আবার দেবগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এমন কিছু করা যায় না যাহাতে নরগণ আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে?"

শ্লেষের সঙ্গে দেবরাজ বলিলেন, "এ কার্যটি একমাত্র তুমিই করিতে পার···"

লজ্জিত হইয়া নারদমুনি কহিলেন, "নারায়ণ, নারায়ণ! কি যে বলেন! আচ্ছা, নরগণ একত্রিত হইবার মূলে আছে কি? তাহারা তো বহু ভাষাভাষী, নিজেদের ভিতরে শিক্ষা, দীক্ষা, ভাবের আদান-প্রদান কিভাবে চলে?"

ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণু বলিলেন, "বহু ভাষাভাষী পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির নরগণের বাক্যালাপের সুবিধার্থে আমরা যত্ন সহকারে তাহাদের দেবভাষা শিখাইয়াছিলাম। অকৃতজ্ঞ নরগণ তাহা

পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে।"

"সর্বনাশের বীজ আপনারা নিজেরাই বপন করিয়াছিলেন। দেবভাষা ওখানে প্রচলনের কি দরকার ছিল? এই দেবভাষার ফলেই তাহাদের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মতের আদান-প্রদান সম্ভব হইয়াছে।" নারদমুনি চিন্তিতভাবে দাড়ি চুলকাইতে লাগিলেন।

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "নারদ, কি ভাবিতেছ? তোমার মস্তকে তো প্রচুর দুষ্টবুদ্ধি খেলা করে, এবার একটা পথ দেখাও?"

"ঐ ভাষার গোড়াতেই ওদের আঘাত করিতে হইবে।"

সমস্বরে দেবগণ নারদমুনিকে প্রশ্ন করিলেন, "কি প্রকারে?"

"নারায়ণ, নারায়ণ!" স্মিতহাস্যে নারদমুনি বলিলেন, "আজ্ঞে, আপনারা পৃথিবী হইতে লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া নরগণের উপরেই পৃথিবীর সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করুন, আর..."

সমস্বরে সকলে বলিয়া উঠিলেন, "আর কি?"

মৃদুহাস্য করিয়া নারদমুনি বলিলেন, "আজ্ঞে, ওদের নিজস্ব ভাষা সম্বন্ধে একটা প্রীতির সঞ্চার করুন এবং কৌশলে জানাইয়া দিন, ঐ দেবভাষার দ্বারাই দেবগণ পূজা-পার্বণের মাধ্যমে নরগণকে শোষণ করিয়া থাকে। এই দেবভাষার চাপে তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বিপন্ন। দেবভাষা পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ মাতৃভাষার উন্নতিতে মনোনিবেশ করাই তাহাদের একমাত্র কর্তব্য।"

দেবরাজ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ইহাতে আমাদের কি লাভ হইবে? আর, তাহারা দেবভাষা পরিত্যাগ করিবেই বা কেন? এই দেবভাষার মাধ্যমেই তাহারা গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে বাক্যালাপ চালাইয়া যাইতেছে।"

হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া নারদমুনি কহিলেন, "ইহা একটি সূক্ষ্ম দাবার চাল। দম্ভ এমনি জিনিস, ভাল-মন্দ সব কিছুকেই ভুলাইয়া দেয়। আর একটু চেষ্টা করিয়া দেখুন যদি সংবাদপত্রগুলিকে হাত করিতে পারেন।"

দেবরাজ বলিলেন, "পৃথিবীর সংবাদপত্র আমাদের ইঙ্গিতে কাজ

করিয়া নরগণের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিবে কেন ?”

“লোভ দেখান। পুণ্য সঞ্চয়ের চেয়ে নরগণের কাছে মূল্যবান আর কিছুই নাই। প্রাণাধিক পুত্রকেও ইহার জন্য বলি দিতে ইহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। এ তো শুধু প্রয়োজন মত একটু-আধটু কালির আঁচড়। তারপর গোপনে পুণ্য সঞ্চয়ে নরগণের সর্বাধিক আগ্রহ।”

দেবরাজ কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া ব্রহ্মা নারদকে কহিলেন, “তোমার ইঙ্গিত আমি বুঝিয়াছি। তোমাকে সর্বপ্রকারের ক্ষমতা দেওয়া হইল। একবার যদি নরগণের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করা যায়—তবে…”

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া দেবাদিদেব বলিলেন, “তবে, তাহাদের ধ্বংস করা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন কার্য হইবে না।”—বলিয়াই সকৌতুকে গঞ্জিকায় টান মারিলেন।

“নারায়ণ, নারায়ণ!” বলিয়া নারদমুনি তাহার বাহনে চাপিয়া পৃথিবীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

… … …

নারদের পন্থায় কাজ হইয়াছে। ভাষার দ্বন্দ্বে পৃথিবী ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। হাজার হাজার নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এক ভাষাভাষী লোক অন্য ভাষাভাষী লোকদের মোটেই সহ্য করিতে পারে না। দেশ তো দূরের কথা—প্রদেশ পর্যন্ত ক্রমাগত ভাগ হইতে হইতে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া যাইতেছে।

নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে পৃথিবীর মানুষ নিজেরাই ক্ষীয়মাণ। দেবাদিদেবের আর অস্ত্র ধরিবার প্রয়োজন হয় নাই। দেবগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন। আবার স্বর্গরাজ্যের প্রমোদ কক্ষগুলি অপ্সরীদের নূপুরনিক্বণে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। দেবরাজ নববর্ষ উৎসবে নারদমুনিকে স্বর্গ-বিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছেন।